সমুদ্রের স্বাদ

জীবনের একরাশ স্বপ্নকে সামনে রেখে পিতৃকুলের ভিটেমাটি উজাড় করে গন্ডগ্রামের আবদুর রশিদ পাড়ি দিয়েছিল আফ্রিকার তেল ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ লিবিয়াতে।

বাবার নাম মোহাম্মদ আবদুর রহমান, গ্রাম : আহ্লাদিনগর, ডাকঘর : টিভি বটিকা, থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী। বয়স বিশ একুশ। বৈধ ভিসা নিয়ে প্রথম চাকরি পেয়েছিল কোরিয়ান কম্পানিতে। নির্দিষ্ট চুক্তির আঠারো মাসের অমানুষিক পরিশ্রম তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি পিতামাতার ভিটেমাটি। কম্পানির শর্ত অনুযায়ী চুক্তি শেষে তাকে দেশে ফিরতে হলো। একবার *হাউয়াই* জাহাজে পা রেখে আবদুর রশিদ বুঝেছিল অর্থ সাফল্য পেতে হলে তাকে আবার শূন্যে উড়তে হবে।

ঢাকার মানুষ বেচাকেনার অলিগলিতে ঘুরে সন্ধান পেয়েছিল একদল স্বদেশি চক্রের যারা শুনিয়েছিল ইওরোপের সোনার হরিণ ধরার কৌশল। সে জেনেছিল লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইওরোপের দুয়ার অর্থাৎ ইটালিতে পা রাখা খুবই সহজ। তাদের আকাশময় স্তুতি বাক্যে আবার লিবিয়ায় আসে আবদুর রশিদ ২০০০ সালের জুন মাসে। কোনো কম্পানিতে ধরা না দিয়ে বিভিন্ন স্থানে দিনমজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকা ভিত্তিক দালাল চক্র চাটগাও নিবাসী দীর্ঘ দিনের লিবিয়া প্রবাসী ফারুক এবং আবদুল কাদেরের সঙ্গে যোগাযোগ হয় যাদের একমাত্র কাজ রশিদদের সংগ্রহ করা। মাথাপিছু এক হাজার থেকে বারোশ ইউএস ডলারের বিনিময়ে ইটালি পৌছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। আবদুর রশিদ রাজি হয় তাদের প্রস্তাবে। এবার শুরু হয় অর্থ আয়ের চেষ্টা।

দিনের সূর্য ডুবে গেলে রাতের নিয়ন আলোতে আবদুর রশিদ অতিরিক্ত কাজের সন্ধান করে বেড়ায়। দীর্ঘ দুই বছর চোরের মতো পালিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে এক সময় চাহিদা মোতাবেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং স্বদেশি দালালদের হাতে তা তুলে দিয়ে আধপেটা দেহের আবদুর রশিদ তাকিয়ে থাকে স্বপ্নকে বাস্তবে দেখার অপেক্ষায়।

অপেক্ষার একদিন শেষ হয়। হঠাৎ একদিন দালাল চক্র জানায়, আগামী সপ্তাহে সাগর পাড়ি দেয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। সে মোতাবেক ২৭ এপৃল ২০০২ তারিখে রাত প্রায় তিনটার সময় তাকে অজ্ঞাত স্থানে মাটির নিচে এক আস্তানায় আনা হলে দেখতে পায় আরো অনেক যুবক তার মতো অপেক্ষা করছে। দলে সর্বমোট ৩১জন স্বদেশি ছাড়া আরো দুই পাকিস্তানি রয়েছে। সকলের বয়স ১৮ থেকে ২২–এর মধ্যে। মাত্র একজন মাঝবয়সী যিনি মাছ ধরা কম্পানিতে চাকরি করতেন, বাড়ি চাটগাও।

গভীর রাতে তাদেরকে কয়েকটি প্রাইভেট গাড়িতে রাজধানী ত্রিপলি থেকে প্রায় দুইশ কুড়ি কিলোমিটার দূরে নির্জন সমুদ্র তীর আবুকামাস নামের স্থানে নামালো। গাড়ির চালক বা মালিকদের আচরণে বোঝা গেল স্থানীয় অ্যারাবিয়ান এবং মাস্তান প্রকৃতির। সকলকে পায়ে হাটিয়ে সমুদ্র তীরে অপেক্ষমাণ ছোট্ট দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট রাবার বোটে গাদাগাদি করে বসিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে

ড্রাম ধরিয়ে বললো, সর্বমোট চারশ পঞ্চাশ লিটার জ্বালানি এতে আছে। একটি ড্রামে চার লিটারের মতো খাবার পানি ছাড়া অন্য কোনো খাবার নিতে দিল না।

মাঝবয়সী সারেংকে একটি রুট ম্যাপ, একটি কম্পাস ও একটি স্পিড মিটার দিয়ে বুঝিয়ে দিল প্রথমে। ঘণ্টায় দশ থেকে পনেরো মাইল স্পিডে চলতে হবে এবং এভাবে একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা চলার পর সাগরের অপরপাশে যে ভূমি দেখা যাবে সেটাই হবে সিসিলি। ওখানে নামার পর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সামান্য ডলারের বিনিময়ে ইটালির নো ম্যানস ল্যান্ডে ট্যাকসি ড্রাইভাররা পৌছে দেবে। বাকি ব্যবস্থা নিজেদের দায়িত্বে।

সারেং তার এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য বিনা পয়সায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই দেরি না করে ইঞ্জিন চালু করে যাত্রা শুরু করলো। দেশে থাকতে আবদুর রশিদ কোনোদিন সাগর দেখেনি। সে ছোটখাটো নদী বা খাল–বিলের সঙ্গে পরিচিত ছিল। রাতের আধারে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি কেমন তা বোঝার আগেই তারা হারিয়ে গেল গভীর সমুদ্রে। পেছনের আলোগুলো আর দৃষ্টিতে এলো না। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সেদিকেই অথৈ পানি আর বড় বড় ঢেউ। নির্দিষ্ট আঠারো ঘণ্টা পার হওয়ার পরও কোনো ভূমির নাগাল তারা পেল না। এর মাঝে একরাত একদিন পার হয়ে গেছে। ক্ষিধের যন্ত্রণায় সকলে কাতর। সামান্য খাবার পানি যা দালালরা দিয়েছিল তা দুজনে খাওয়ার পর বমি করেছে। কারণ সে পাত্রে আগে মবিল ছিল।

পরের রাতে শুরু হলো সাগরে গর্জন। প্রচণ্ড বাতাসে কলার মোচার মতো রাবার বোট ঢেউয়ের তালে একবার উচু হচ্ছে আবার আছড়ে নিচে নামছে। এভাবে রাতটুকু কেটে গেল, ভোরের আলো দেখা দিল। সমুদ্রে বাতাস সমানে বইছে। দূরে দেখা গেল বিশাল আকৃতির একটা মালবাহী জাহাজ ইঞ্জিন বন্ধ করে ভেসে যাচ্ছে প্রচণ্ড বাতাসে।

আবদুর রশিদদের জেলে কম্পানির অভিজ্ঞ সারেং বুঝতে পারলো সামনে প্রচণ্ড বিপদ। সে বাতাসের চেয়ে গতি বাড়াতে গিয়ে রাবার বোটকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেল। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে রাবার বোটের সম্মুখ ভাগের কাঠের আবরণ ভেঙে গিয়ে টিউবের অতিরিক্ত অংশের বাতাস বেরিয়ে বোটকে কাত করে দিল। সারেং বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বললো।

যাত্রীদের অনেকে ভয়, ক্ষিধের যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখন তারা ইওরোপের স্বপ্ন বাদ দিয়ে জীবনের স্বপ্নকে বেশি কাছের বলে স্বীকার করলো। সিদ্ধান্ত নিল বাতাস যেদিকে নিয়ে যায় যাক, জ্বালানি যা আছে তা বাতাসের বেগ কমলে ফিরে আসার জন্য লাগানো যাবে।

এখন রাবার বোটটা সোলার মতো গভীর সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে পরের রাতে বাতাসের জোর কমে গেলে কম্পাসে বিপরীত দিক নির্ণয় করে ইঞ্জিন চালু করে চলতে চলতে এক সময় দূরে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে সকলে যেন জীবন ফিরে পেল। শেষ রাতের দিকে তারা তীরে নামতে গিয়ে বুঝলো যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার কাছাকাছি কোনো জায়গায় তারা নেমেছে।

তীর ছেড়ে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই টহল পুলিশ ধরে ফেললো। পিকনিকের মিথ্যা অজুহাত তাদের মন গলাতে পারলো না। ফলে দুর্বল দেহ আরো কিছু আঘাত সয়ে হাজতে আশ্রয় পেল। প্রথম যাত্রার এ রকম সমাপ্তি হলো।

দালাল চক্র খবর পেয়ে তাদের বিভিন্ন কৌশলে ছাড়িয়ে এনে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলো। ইটালি না পৌছার কারণ বা দোষ সব রশিদদের ওপর চাপিয়ে শেষ সুযোগ নেয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু অর্থ সমপরিমাণ আবার যারা দিতে পারবে শুধু তারাই যাবে।

অদম্য আবদুর রশিদরা ইটালিতে বিভিন্ন খরচের জন্য এক হাজার ডলার অতিরিক্ত নিজের কাছে রেখেছিল। আবার দালালের হাতে তা তুলে দিয়ে একই কায়দায় ২০০২ সালের জুন মাসের শেষ দিকে সমুদ্রযাত্রা করলো। কপাল মন্দ এবার। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা চলার পরও তীরের দেখা না পেয়ে আবার সমুদ্র ঝড়ে পড়ে মাঝসাগরে দোল খেতে লাগলো। আছড়ে পড়া ঢেউ রাবার বোটের ভেতর পড়াতে প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে গেল। দ্রুত সবাই পানি ছেচে কোনোমতে রক্ষা পেল।

দূরে একটা মাছ ধরা ট্রলার দেখে সেদিকে এগিয়ে জানতে পারলো এটা মালটার জলসীমা। দয়াপরবশ হয়ে ট্রলার থেকে রশি ছুড়ে দিলে তারা রাবার বোটকে ট্রলারে গায়ে ভেড়াতে পারলেও কাউকে ট্রলারে আশ্রয় দিল না। তবে কিছু সিগারেট আর খাবার দিয়ে সাহায্য করলো। পরে ঝড় থেমে গেলে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে রশির অপরপ্রান্ত কেটে দিয়ে ট্রলারটি গভীর সমুদ্রে চলে গেল।

অর্থের চেয়ে জীবন অনেক বেশি মূল্যবান এ সত্যটাকে বরণ করে আবার তারা আবুকামাসের সমুদ্র তীরে ফিরে এসে স্রষ্টার প্রতি দয়া করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাস্তায় ওঠামাত্র কোস্ট গার্ডের হাতে ধরা পড়লো। এবার শারীরিক নিগ্রহ একটু বেশি পেয়ে দীর্ঘ হাজতবাস কপালে জুটলো। হাজতবাসও এক সময় শেষ হয়ে মুক্তি মিললো। এবারের মুক্তি জীবনকে ভালোবাসার পথে ফিরে যেতে সায় দিল। আর নয়, সোনার হরিণ, আর ইওরোপ নয়, টাইটানিক যাত্রার এখানেই সমাপ্তি হোক।

আবদুর রশিদ জীবনের শেষ সম্বল দেশি প্রতারক চক্রের হাতে তুলে দিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে নোনা চোখের জলে চিবুক ভিজিয়ে গত ১ মে ২০০৩ সালে ত্রিপলি এয়ারপোর্ট দিয়ে ফিরে গেছে দুঃখিনী মায়ের বুকে। আবদুর রশিদদের শুধু একটাই আক্ষেপ, সে পারলো না তার গরিব পিতার হারানো ভূমিটুকু ফিরিয়ে দিতে। তার এই পরাজিত জীবনের গ্লাসি সে ভুলবে কি করে!

আবদুর রশিদকে কেউ যদি একটু সান্ত্বনা দিয়ে দুই কলম লেখেন তাহলে হয়তো সে খুজে পাবে বাচার অন্য কোনো প্রেরণা। আপনার সহানুভূতিই হবে তার কল্পলোকের সোনার হরিণ পাওয়ার শেষ উপ্যাখান। এ রকম সোনার হরিণ ধরার জন্য কেউ যেন ভূমধ্যসাগরের নোনা জলে পরিচয়হীন লাশ হয়ে না ভেসে বেড়ায়।

বেনগাসির, ত্রিপলি, লিবিয়া থেকে

লম্পট

– রুহী

আমি দেখতে মোটামুটি সুন্দরী ধরনের মেয়ে। এটা অবশ্য জানতে পেরেছি পাড়ার তরুণ সমাজের কল্যাণে। কারণ প্রতি সপ্তাহে তাদের কাছ থেকে ডজন খানেক চিঠি পেতাম। চিঠি প্রেরকদের মধ্যে কেউ আমার টানা টানা চোখের প্রেমে পড়েছে, কেউ বা আমার মেঘের মতো কালো চুলের প্রেমে কিংবা আমার মায়াবী হাসির প্রেমে পড়েছে বলে জানাতো। এই সব রোমিওদের চিঠি পড়ে আমার সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হতাম। তাদের চিঠিতে লেখা ভালোলাগা, ভালোবাসা, প্রেম এই বিষয়গুলো আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করতো না বিধায় চিঠির উত্তর দেয়া তো দূরের কথা, একবার পড়েই একেকটা চিঠিকে বত্রিশ টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিতাম।

হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ির সামনের বাড়িতে একজন লম্বা, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক ভাড়াটে এলো। একজন আকর্ষণীয় পুরুষ বলতে যা বোঝায় সে তাই। আমি তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। কলেজে যাওয়া আসার পথে প্রায় সময় তাকে বারান্দায় দাড়িয়ে থাকতে দেখতাম। প্রেম, ভালোবাসার প্রতি এতোদিন আকর্ষণ না থাকলেও ছেলেটিকে দেখার পর তার প্রেমে পড়ে গেলাম।

একদিন বিকেলে বাড়ির পেছনের বারান্দায় বসে বুদ্ধদেব বসুর *তিথিডোর* বইটা পড়ছিলাম। এমন সময় আব্বার গলা শোনা গেল, কই রে রুহী, আমাদের দুই কাপ চা দিয়ে যা তো।

আব্বাকে নিয়ে হলো এক সমস্যা। প্রতিদিন বিকেলে পাড়ার কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে আসবেন। চা খাওয়াবেন আর তার সঙ্গে গল্প করবেন।

চা নিয়ে ড্রয়িংরুমে যেতেই আমার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বাবা আজ যাকে ধরে এনেছেন সে আর অন্য কেউ না, আমার স্বপ্নের নায়ক যাকে এক নজর দেখার জন্য সারা দিন তার বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

চা দিয়ে চলে আসার সময় বাবা বললেন, রুহী, শোন। এ আমাদের সামনের বাড়িতে থাকে। তুই এর সঙ্গে আলাপ কর, আমি আসরের নামাজটা পড়ে আসি।

আলাপ কি করবো, আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হচ্ছে না। যন্ত্রের মতো সোফায় বসলাম। এক সময় সেই নীরবতা ভঙ্গ করলো। জানতে পারলাম তার নাম মাহফুজ। ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে। বাড়ি নোয়াখালি। তার বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। সে শুধু ঢাকায়। প্রায় পনেরো মিনিট কথা বলার পর আব্বা চলে আসায় আমি উঠে যাই।

তারপর থেকে মাহফুজ নিয়মিত আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া শুরু করলো। একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানালাম। সে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করলো। শুরু হলো আমাদের ভালোবাসার পথ চলা।

কিন্তু আমাদের এই ভালোবাসার কথা বেশি দিন গোপন থাকলো না। কিভাবে যেন আম্মা ব্যাপারটা জেনে গেলেন। তিনি আব্বার কাছে বলে দিলেন। আব্বা শুনে প্রচণ্ড রাগারাগি করলেন। চাল-চুলোহীন ওই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

এদিকে আমার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাত্র দেখা শুরু হয়েছে। আমাদের কাজের মেয়ের মাধ্যমে মাহফুজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। কয়েকদিন পর কাজের মেয়েটি জানালো, মাহফুজ নাকি বাসা ছেড়ে চলে গেছে। এ কথা শুনে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। বহু কষ্টে মাহফুজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রুবেলের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমার বদরাগী বড় ভাইয়া নাকি তাকে বলেছেন, আমাকে ভুলে যেতে এবং এখান থেকে চলে যেতে। না হলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তাই সে আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করেই চলে যায়।

বড়লোক বাবার একমাত্র সুন্দরী মেয়ের জন্য পাত্র পেতে বেশি দেরি হলো না। পাত্র আমেরিকায় থাকে। বিয়ে করে বৌ নিয়ে আবার চলে যাবে। পাত্রপক্ষ এসে আমাকে দেখে পছন্দ করে এবং সেই সঙ্গে বিয়ের দিন, তারিখ ঠিক করে যায়।

বাবার সম্মান, মায়ের করুণ মুখের দিকে চেয়ে বিয়েতে রাজি হই। মহাধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। বরের নাম মনির। টাকা পয়সার অভাব নেই।

বিয়ের তিন মাসের মাথায় স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় চলে এলাম। এসেই চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হলাম। স্বামী একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করে। সন্ধ্যায় ফেরে। সারা দিন বসে বসে টিভি দেখি আর সময় মতো রান্না-বান্না করি। এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।

একদিন বুক শেলফে বই গোছানোর সময় একটা ছবির অ্যালবাম পাই। তাতে মনিরের সঙ্গে একটি বিদেশি মেয়ের বেশ কিছু ছবি ছিল। এর মধ্যে কিছু ছবিতে তাদের দুজনকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাচ্ছে। ছবিগুলো দেখার পর স্বামীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। অ্যালবামটা যথাস্থানে রেখে দিলাম। এ ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

কয়েকদিন পর এক সকালবেলা খুব জোরে দরজায় নক হওয়ায় খুলে দেখি স্বর্ণকেশী এক তরুণী দাড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলাম। মনিরের সঙ্গে অ্যালবামে যার ছবি দেখেছি এই মেয়েটি সেই মেয়ে। মেয়েটি দুর্বোধ্য ইংরেজিতে কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম, আমি মনিরের কি হই এটাই সে জানতে চাচ্ছে।

বললাম, মনির ইজ মাই হাজব্যান্ড।

কথাটি শোনা মাত্র মেয়েটি মুখ বিকৃত করে একটা শব্দ বলে দ্রুতগতিতে চলে যায়।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর ভালো করে দেখার জন্য অ্যালবামটা আবার হাতে নিলাম। হঠাৎ একটা ছবির পেছনে এক টুকরো কাগজ দেখতে পেলাম। বের করে দেখি ইংরেজিতে লেখা চিঠি। মনিরের হাতের লেখা। চিঠির শুরুতে *ডিয়ার মারিয়া* শব্দটি লেখা রয়েছে। বুঝতে বাকি রইলো না ছবির মেয়েটি অর্থাৎ একটু আগে আসা মেয়েটির নাম মারিয়া। চিঠির মধ্যে *মাই সুইটহার্ট* শব্দটি বেশ কয়েকবার লেখা রয়েছে। সারাটা দিন যে কতো কষ্টের মধ্যে কেটেছে তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না।

রাতে মনির এলে তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, মারিয়া কে?

প্রথমে সে না চেনার ভান করলো। যখন চিঠিটা দেখালাম তখন বললো তার আমেরিকান বন্ধু। রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় পরিচয় হয়েছিল। সকালে যে মেয়েটি এসেছিল সে কথা জানালাম। সে

কেমন জানি চমকে উঠলো। মারিয়ার সঙ্গে তার ছবিগুলো দেখিয়ে বলি কোনো স্বামী-স্ত্রীও তো এতো ঘনিষ্ঠভাবে এবং খোলামেলাভাবে ছবি ওঠায় না।

এরপর দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে সে স্বীকার করে, সে মারিয়াকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু তার বাবা-মা বিদেশিনী বৌ মেনে না নেয়াতে দেশে গিয়ে আমাকে বিয়ে করে।

তার কথা শুনে মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। নাওয়া-খাওয়া এক প্রকার ছেড়েই দিলাম। কোনো প্রকার খোজ-খবর না নিয়ে একটা লম্পট চরিত্রের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়ার জন্য মা-বাবাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। মাস দুয়েক পর লম্পট স্বামীকে ছেড়ে দেশে চলে এলাম।

আজ প্রায় তিন বছর হলো একাকী জীবন কাটাছি। শুনেছি লম্পটটি নাকি দেশে এসে আবার বিয়ে করেছে। মাহফুজের সঙ্গে এখন মাঝে মধ্যে দেখা হয়। কিন্তু তাকে এখনো আমার দুর্ভাগ্যের কথা জানাইনি।

আমার মা-বাবার ভুলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। তাই অভিভাবকদের প্রতি আমার অনুরোধ, কোনো প্রবাসীর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে আগে পাত্র সম্বন্ধে ভালো করে জেনে নেবেন। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেবেন না। না হলে আমার মতো আপনার মেয়ের জীবনটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

অশরীরী প্রেম

– শাহীন

সে আমার আদরের মনি, আমার প্রাণের স্পন্দন। ছাত্র জীবনের সেই সোনালি দিনগুলোতে সে আমার ছিল না। সে আমার নতুন আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এক আধবার আমাদের দেখা হয়েছে শুধু। আমার বিদায়ের বেলায় তার চোখেও দেখেছিলাম কয়েক ফোটা নোনা জল। সেই তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ, সেই আমার পূর্ণ প্রেমের স্মৃতি দুজনের কেউই কখনো ভাবিনি আমরা পরস্পরের নিকটতম হয়ে উঠবো কোনোদিন।

পড়ালেখার পাট চুকিয়ে সেই ১৯৯৮ সালে প্রবাসে আসার পর থেকে তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ হতো চিঠিতে। দুই এক মাস পর কোনো উপলক্ষে তার আপুর কাছে চিঠি দিলে তাকেও দুই কলম লিখতাম সৌজন্যবশত। বুঝতে পারতাম সে তাতে আনন্দ পেতো। কিন্তু কোনো ভাবাবেগ ছিল না তখনো। তবে মাঝে মধ্যে তার অনুযোগ শুনতে হতো। দীর্ঘ দিন চিঠি না দিলে সে লিখতো, আপুর পত্র এলে কতো আশা করে থাকি আমারও একটা চিঠি থাকবে। যখন দেখি আমার কাছে লেখেননি তখন নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। ইত্যবসরে তার বড় বোন মানে আমার ভাবী চলে এলেন প্রবাসে আমার ভাইয়ের কর্মস্থলে। বোনের সঙ্গে যোগাযোগের সুবাদে আমার সঙ্গেও যোগাযোগ বেড়ে গেল। শূন্য থেকে বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌছালাম আমরা ক্রমে ক্রমেই।

২০০০ সালে রিয়াদ থেকে জেদ্দা চলে গেলাম নতুন চাকরি নিয়ে। যাবার বেলায় তাকে লিখলাম, এতোদিন আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগের একটা উপলক্ষ ছিল তোমার বোন। এখন আমি অন্যত্র বদলি হচ্ছি। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা এখন একটু স্পর্শকাতর বৈকি। তবে এ ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্তত একটিবার ভেবে দেখবে তা উচিত হবে কি না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমরা শুধু বন্ধু নই আত্মীয়ও বটে। সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বের কারণে যেন আত্মীয়তায় বিঘ্ন না ঘটে। তাই তুমি চিঠি দিলে তো খুশি হবোই আবার না দিলে অখুশি হবো না একটুও।

সে উত্তরে লিখলো, আমার বন্ধুর কাছে আমি চিঠি দেবো না তো কার কাছে দেবো। অন্যসব কোনো সমস্যা নয়।

এবার আমাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার পালা। পত্র যোগাযোগের মাত্রাটা যেন বেড়েই গেল। তার চিঠির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠতে লাগলো অন্য রকম ঘনিষ্ঠতা। এক সময় সে লিখলো, আমাকে কখনো দুঃখ দেবেন না তো?

বললাম, আমি কি তোমার সুখ কিংবা দুঃখ দেয়ার পর্যায়ে আছি? এখানে সে কথা আসছে কেন? যা বলার সরাসরি বলবে।

একদা এক শুভক্ষণে সে লিখলো, তোমাকে আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে আমি পেতে চাই। আমার বিশ্বাস আমাকে তুমি ফিরিয়ে দেবে না।

যা ভাবছিলাম তা হলো। আমি একই সঙ্গে পুলকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলাম। তার সঙ্গে প্রথমবারের মতো ফোনে কথা বললাম, বললাম আমি জীবনের একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। এখন আমার দ্বারা নিছক প্রেম-ভালোবাসা হবে না। এখন তেমন কাউকে যদি পছন্দই করি তাহলে তার চূড়ান্ত পরিণতি অবশ্যই বিয়ে ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং আমাকে ভাবতে দাও। আরো বললাম, আমরা মধ্যবিত্তরা অভিভাবকদের মতামতের বাইরে সমাজ-সংসার ভেঙে কিছুই করতে পারি না মানসম্মানের খাতিরে। উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের মতো লা-পরোয়া ভাব আমাদের জন্য বড়ই বেমানান। এ ধরনের কিছু করার আগে আমাদেরকে অবশ্যই গার্ডিয়ানদের অনুমতি নেয়া উচিত।

সে বললো, ঠিক আছে, আমার দুলাভাইকে আমি (আমার ভাইয়া) চিঠি লিখছি আর আপনি আমার আপুকে (আমার ভাবী) জানান।

এমনিতে একমাত্র দেবর হওয়াতে ভাবীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ এবং অনেকের কাছে ঈর্ষনীয়। প্রতিবার আমি রিয়াদ থেকে জেদ্দা যাবার প্রাক্কালে তার অশ্রুসজল মুখ তার প্রতি আমার ভালোবাসাটা আরো বাড়িয়ে দিতো। জেদ্দা থেকে তাকে প্রতিদিন ফোনে ঘুম ভাঙানোর ব্যাপারটা ছিল আমার রুটিন ওয়ার্ক।

একদিন তাকে একটু ভূমিকা নিয়ে তার বোনের ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম, আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে অগ্রসর হবো। না হলে ভুলেই যাবো যে, আমার এ ব্যাপারে কোনো কথা হয়েছিল।

এরমধ্যে আমার ভাইয়াও তার শ্যালিকার চিঠি পেলেন। সে গোটা গোটা অক্ষরে সরাসরি লিখলো, সেদিন আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা হয়েছে। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, এ রকম দীর্ঘ সময় কথা বলার মানে কি? হ্যা, আমি আপনার ভাইকে ভালোবাসি। সেও আমাকে। আশা করি আপনি অমত করবেন না।

কয়েকদিন পর ভাবী আমাকে ভাইয়ার মতো জানালেন। আমাদের বাবা–মা যদি রাজি থাকেন তাহলে এ বিয়েতে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। তার (ভাবীর) পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো সমস্যা হবে না বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

এবার আমার মনিকে লিখলাম, কোথায় যেন পড়েছিলাম গাছের মতো ভালোবাসতে পারলে পাথরেও ফুল ফোটানো যায়। হৃদয়ের সব আকুতি দিয়ে চাইলে যে কিছুই বাস্তব হয়ে ধরা দেয় হাতের মুঠোয় তা আজ তুমি বাস্তবে করে দেখালে, এর সব কৃতিত্বই তোমার।

সেই থেকেই আমাদের প্রেম যাত্রা। সে আমার মনি আর আমি এক হৃদয়।

তিন বছর হতে চললো। দিনে দিনে আমাদের সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ইতিমধ্যে তার অভিভাবকদেরও জানানো হয়েছে, তারা সানন্দেই রাজি হলেন। তবে শর্ত হলো, দেশে গিয়ে অবশ্যই আমার অভিভাবকদের সম্মতি নিতে হবে। এই সহজ প্রাপ্তিতে আমরা খুবই উৎফুল্ল হলাম। আমাদের প্রেম অপ্রতিরোধ্য গতি লাভ করলো। প্রতি সপ্তাহে পরস্পরের চিঠি না পেলে, কণ্ঠস্বর না শুনলে যেন নাভিশ্বাস হয়। কখনো আমি ফোন করছি তো কখনো সে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী ফোনে মধুর আলাপন, খুনসুটি চলে আমাদের মাঝে। মনেই হয় না কখনো আমরা একে অপর থেকে যোজন যোজন দূরে যেন বা *নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই* কিংবা *দুই চোখের মাঝে যতো দূর আছে, তুমি আছো তার চেয়ে আরো কাছে।* আমি জানি না এমন অদেখা প্রেম কারো জীবনে আসে কি না। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের কোনো ডাক কাউকে এমন ব্যাকুল করে কি না।

তার পান থেকে চুন খসলেই আমাকে প্রয়োজন পড়ে। বলে, এই, তুমি কি করছো। একবার এসে আমাকে দেখে যাও, আমি আর একা একা পারছি না। আমাকে এবার একটু মুক্তি দাও।

তার এমন নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় আপ্লুত হই, তার ভালোবাসার অবগাহনে উদ্বেল হয়ে বলি, আমার মনি, এই তো আর কয়েকদিন পরই দেশে আসছি। তুমি আরেকটু সবুর করো।

কিন্তু সাধ ও সাধ্যের সম্মিলন হয় না বলে আজও যাওয়া হয়নি আমার।

আজও সে আমার পথ পানে চেয়ে চেয়ে বলে, *জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া, ছল ছল আখি মোর জল ভরা মেঘে যেন ছাওয়া।*

তার রিন রিন মিষ্টি কণ্ঠ আমার কানে ঝংকার তোলে। তার ভালোবাসার কথামালা আমার হৃদয় ছুয়ে যায়। প্রশ্ন করি, আজ তুমি কি পরেছো? শাড়ি, না সালোয়ার–কামিজ?

আমার বালখিল্যতায় সে হাসে। ওপ্রান্ত থেকে আমার কানে ভেসে আসে আহবান, আমাকে একটু আদর করে দাও, আজ অনেক দিন তুমি আমাকে আদর দাওনি।

তার আহবানে সাড়া দিই যান্ত্রিক মোবাইলে, আমার সে সাড়া সহস্র মাইল পাড়ি দিয়ে মুহূর্তেই তাকে জাগিয়ে তোলে। সুখের অতিশয্যে, আবেগে তার কণ্ঠ কম্পিত হয় যেন বা প্রণয়ের প্রথম সুখ কুমারীর। নিজেকে অপরাধী ভাবি। বলি, কেন তুমি এমন এক উড়নচন্ডিকে ভালোবাসলে? এমন অস্পর্শী, অদেখা প্রেম কেউ করে আজকাল?

তার একটাই উত্তর, যেখানে, যে অবস্থায় তোমার যেটুকু পাবো তাতেই খুশি। বিয়ে করলে তো তোমাকেই করবো। না হলে বিষ খাবো। আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিলে সেখানে যাবো না, আমার লাশ যাবে। প্লিজ, আমার হৃদয়, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না কখনো। তুমি অন্য কাউকে

নিয়ে সংসার করবে তা সইতে পারবো না। তুমি যে আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার জীবনের অমূল্য ধন। তাছাড়া আমাদের সম্পর্কের কথা তো সবাই জানে। এখন তুমি যদি আমাকে অস্বীকার করো তাহলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

কিন্তু কে জানতো সে কথাটিই একদিন সত্যি হবে আমার জীবনে। *বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।*

ডিসেম্বর ২০০২–এ আমার সেই আরাধ্য ভালোবাসা, আমার অশরীরী প্রেম আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতমের পার্শ্ববর্তিনী হয়ে আমার সব কিছুকে কবরস্থ করে তার ফুলশয্যার রাতে। অজুহাত, আমার অভিভাবকের অসম্মতি।

না, সে আত্মহত্যা করেনি, সে দিব্যি সুখে আছে তার স্বামী–সংসার নিয়ে।

সুখ নেই কেবল আমার।

আমি আছি তার না থাকাটা নিয়ে, তার স্মৃতি রোমন্থনে।

সউদি আরব থেকে

ইউক্রেনের পুলিশ

– মোহাম্মদ সরওয়ার জাহান

২৮ জানুয়ারি ২০০৩। ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান শিপিং লাইন্সের জাহাজে জয়েন করতে যাচ্ছি ইউক্রেনের ওডেসা পোর্টে। যাত্রাপথে দুবাইতে দশ ঘণ্টা এবং টার্কির ইস্তাম্বুলে ছিল দুই ঘণ্টার বিরতি।

রাত সাতটা নাগাদ আমার স্ত্রী, মেয়ে, ছোট ভাই সরাফত এবং ভাগ্নে ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে আমাকে বিদায় জানিয়ে গেল। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হয়ে সরাসরি ঢুকলাম সুপরিসর এমিরেটস এয়ারলাইন্সের প্লেনে। সিট নিয়ে বসে গেলাম। রাত নয়টায় এমিরেটস এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজ আকাশে ডানা মেলে উঠে গেল দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে।

মধ্য রাতে দুবাইতে পৌছালাম। এয়ারপোর্টে ডিউটি ফ্ শপে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা এবং একটু কেনাকাটা করে ট্রানজিট লাউঞ্জে গিয়ে ইজিচেয়ারে দিলাম এক ঘুম। সকাল ছয়টায় উঠে হাত–মুখ ধুয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে নাশতা করে নিলাম। রেস্টুরেন্টে দুবার খাওয়ার জন্য দুটি টোকেন রাতেই এমিরেটস এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল।

দুপুরে প্লেনে ওঠার আগে রেস্টুরেন্টের বুফেতে আরেকবার খেয়ে আবার এমিরেটস এয়ারলাইন্সে রওনা হলাম ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে। বিকেলে পৌছে গেলাম ইস্তাম্বুলে। ট্রানজিটে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করে সন্ধ্যায় ইউক্রেন এয়ারলাইন্সে রওনা হলাম ইউক্রেনের ওডেসা–র উদ্দেশ্যে। প্লেনে আমার পাশের সিটে বসেছেন এক ভদ্রমহিলা।

প্লেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়ি কোথায় এবং কোথায় যাচ্ছো।

বললাম, আমার দেশ হলো বাংলাদেশ। যাচ্ছি ইউক্রেনের ওডেসা–তে।

আমিও মহিলার পরিচিতি জেনে নিলাম। মহিলার জন্ম ইউক্রেনেই। আমেরিকার এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে বর্তমানে নিউ ইয়র্কে বসবাস করছেন। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই কলেজে লেখাপড়া করছে। দুই সপ্তাহের জন্য ইউক্রেনে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন।

মহিলা বৃহত্তর রাশিয়া এবং ইউক্রেন সম্বন্ধে আমাকে অনেক ধারণা দিলেন। আরো বললেন, ইউক্রেনের ওডেসা শহর খুবই সুন্দর। তুমি শহরটা ঘুরে দেখে নিও। তবে রাতের বেলায় পুলিশের ঝামেলা বড়ই বিরক্তিকর।

মহিলা সদালাপী, ভদ্র ও হৃদয়বান। কথা বলতে বলতে ইউক্রেনের ওডেসা এয়ারপোর্টে পৌছে গেলাম। মহিলাকে গুডবাই দিয়ে বিমান থেকে নেমে গেলাম। ইরান শিপিং এজেন্ট–এর পক্ষ থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে নিতে এলো। মাইক্রোবাসে করে আমাকে পোর্টের জেটিতে *এমভি ইরান আশরাফি* জাহাজে পৌছে দিয়ে গেল।

দুই দিনে খুব ব্যস্ততার মধ্যে আমার দায়িত্ব বুঝে নিলাম। দুই দিন পর শহরে বের হলাম। উদ্দেশ্য, ঘোরাফেরা করা আর বাংলাদেশে ঢাকায় একটি ফোন করা।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বরফ পড়েছে। মাইনাস আট সেলসিয়াস তাপমাত্রা। হাত জমে আসছে। ঢাকা থেকে আসার সময় আমার স্ত্রী বলেছিল শীতের হ্যান্ড গ্লাভস সঙ্গে নিতে। তখন তার কথার গুরুত্ব দিইনি। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি স্ত্রীর কথা না শোনার মজাটা। বরফের মধ্যে ফুটপাথ দিয়ে হাটতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। মনে মনে ভাবছি ঘোরাফেরা তো হবে না। একটি ফোন–ফ্যাক্সের দোকান পেলে ফোন করে জাহাজে ফিরে যাবো। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন হ্যালো বললো।

তার ডাকে কোনো সাড়া না দিয়ে হাটার স্পিড আরো বাড়িয়ে দিলাম। ভাবছি মদ খেয়ে মাতাল কোনো লোক হতে পারে। আবার ভাবছি প্লেনে আমার পাশের সিটের মহিলা তো বলেছিলেন রাতের বেলা পুলিশের ঝামেলার কথা।

এদিকে আমার পেছনে লোকটিও মনে হচ্ছে দ্রুত হাটছে এবং আমাকে অনুসরণ করছে।

শেষ পর্যন্ত পেছন থেকে কে যেন আমার পিঠে হাত দিয়ে আবারও বললো, হ্যালো।

এবার আমি দাড়িয়ে গেলাম। পেছনে ঘুরে দেখি কালো জ্যাকেট এবং কালো টুপি পরা দুইজন লোক। দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি এরা পুলিশের লোক হবে। পরিচয় দিল তারা পুলিশের লোক। আমার শোর (Shore) পাস দেখতে চাইলো।

পকেট থেকে শোর পাস বের করে দেখালাম।

দেখে বললো, তোমার শোর পাসে ছবি লাগানো নেই কেন?

বললাম, তোমাদের দেশের ইমিগ্রেশন অফিসার তো ছবি লাগানোর কথা কিছু বলেনি। আমার কি করার আছে।

পুলিশ বললো, যেহেতু তোমার শোর পাসে ছবি নেই, তাই তোমাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।

বললাম, আমার কোনো আপত্তি নেই। চলো যাই পুলিশ স্টেশনে।

কোনো ভয় পাচ্ ছি না। কারণ আমার শোর পাস ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি তাদের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের পুলিশের মতোই ভয়–ভীতি দেখিয়ে কিছু টাকা আদায় করা যায় কি না সেই চেষ্টাই হয়তো করছে। পুলিশের সঙ্গে হেটে হেটে মেইন রোড থেকে লেনে ঢুকলাম।

পুলিশ দুইজন পরস্পর রাশিয়ান ভাষায় কি যেন আলাপ করলো এবং দাড়িয়ে গিয়ে আমাকে বললো, দেখো, তোমার শোর পাসে ছবি নেই। তাই কিছু ফাইন দিতে হবে। কিছু ডলার দিয়ে এখান থেকেই চলে যেতে পারো।

বললাম, ডলার দিতে পারবো না। চলো পুলিশ স্টেশনে। তোমাদের সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবো।

এমন কথা শুনে পুলিশ দুজন রাশান ভাষায় পরস্পর কথা বললো। তারপর বললো, থাক, যেতে হবে না পুলিশ স্টেশনে এবং ডলারও দিতে হবে না। চলো যাই তোমাকে ফোনের দোকান দেখিয়ে দিই।

পরে আমাকে একটি ফোন–ফ্যাক্সের দোকানে নিয়ে গেল এবং দোকানের মহিলাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলে দিল যেন আমাকে বাংলাদেশে ফোনের কানেকশন করে দেয়। তারপর পুলিশ দুইজন সরি বলে হ্যান্ডশেক করে গুডবাই জানিয়ে চলে গেল।

ইরান থেকে

ফটো

– নিজাম আহমেদ

আমাদের বিয়ের এক বছরের মাথায় আমার মেয়ের জন্ম হয়। মা–মণির নাম রেখেছি সালমা। বেকার অবস্থায় ছিলাম বলে সারাক্ষণ তার পেছনে সময় লাগাতাম। তাকে কোলে–পিঠে করে আদর যত্ন দিয়ে বড় করতে লাগলাম। সে যখন পুরোপুরি হাটতে শিখেছে তখন তাকে আর ছাড়তে পারি না। আমার পিছু নেবেই। বাজারে যাবার জন্য হাতে শার্ট নিয়েছি অমনি সে আমার লুঙ্গিটা খামচিয়ে ধরে কান্না জুড়ে দেবে আর বলবে, আব্বু, আমিও বাজারে যাবো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে হাটিয়ে বাজারে নিয়ে যেতাম। গোসল করতে যাবার সময়ও একই অবস্থা। সঙ্গে যাবেই। কিছুতেই নিষেধ শুনবে না। কারণ অত্যধিক আদর দিয়েই তাকে এমনটি করেছি। একদিন গোসল সেরে এসে গায়ে রোদ লাগানোর জন্য উঠানে বসে তার সঙ্গে দুষ্টুমি করছি। আমার মুখটা গামছা দিয়ে ঢেকে জিভটা নাড়তে লাগলাম এবং বললাম, আব্বুকে একটা কিস দাও তো?

অমনি তার নতুন গজানো ধারালো দাত দিয়ে আমার জিভে ঘচাং করে কামড় বসিয়ে দিল। আচমকা ভ্যাবাচেকা খেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। দেখলাম জিভের নিচ দিয়ে কিছুটা কেটে গিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

আমার আম্মা এসে সব শুনে হাসতে লাগলেন এবং তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাবার পরামর্শ দিলেন। আমি বের হতে যাবো অমনি আম্মা চুপিসারে বললেন, মেয়ে জিভে কামড় দিয়েছে তা ডাক্তারকে বলো না, সবাই লজ্জা দেবে। বলবে, আখ খেতে গিয়ে কেটে গেছে।

মাত্র দুই বছর বয়সেই সে অনেক কিছু আয়ত্ব করে ফেললো। বুড়ো মানুষ লাঠি হাতে কিভাবে হাটে, পা ছুয়ে সালাম করা, দুই চোখ দিয়ে নানান ভঙ্গিমা ইত্যাদি দেখে বড়রা ঠাট্টার ছলে বলতেন, এ মেয়ে বেশি দিন বাচবে না।

তখন যদিও বেকার ছিলাম, হাত খরচার জন্য প্রাইভেট টিউশনি করতাম। মাস শেষে যা পেতাম, বেশির ভাগটা মা-মণির পেছনে খরচ করতাম। নানান রকমের পোশাক, খেলনা, প্রসাধনী ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার জিনিস আনতাম। তখন কোনো এক ঈদের আগের দিন অর্থাৎ *চান রাতে* টিউশনির টাকা পেতে একটু দেরি হয়ে গেল। টাকা হাতে পেয়েই মা-মণির জন্য কিছু পোশাক এবং প্রসাধনী কিনে বাড়ি গিয়ে দেখি সে ঘুমিয়ে গেছে। ছোটদেরকে কাচাঘুমে জাগাতে নেই জাতীয় কথাটা তুচ্ছ করে তাকে জাগিয়ে তুলে আমার আনা ঈদ উপহারগুলো তার সামনে তুলে ধরলাম। সে কি যে খুশি হলো তা বলার মতো নয়। দুই পা সামনের দিকে লম্বা করে বসে আয়না হাতে নিয়ে ঠোটে লিপস্টিক লাগাতে লাগলো। তখনো তার ঘুমের আমেজটা কিছুটা রয়ে গেছে। এসব দৃশ্য দেখে আব্বা-আম্মা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

অবশেষে তার আড়াই বছর বয়সে ১৯৮৩-এর মাঝামাঝিতে সোনার হরিণের খোজে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে আসি। আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসি মা-মণির কথা দিয়ে তোলা ক্যাসেট এবং বিভিন্ন সাইজের ফটো। অবসর সময় ফটো এবং ক্যাসেট নিয়ে বসতাম।

একদিন রাতে মুরগির মাংস দিয়ে খাচ্ছিলাম। অর্ধেক খাবার শেষ হতেই তার কথা মনে উঠলো। মনে হলো, আমার মা-মণি কি নিয়মিত মুরগির মাংস খেতে পাচ্ছে?

না, আর খাওয়া হলো না। ঝাপসা চোখ নিয়ে খাওয়া ছেড়ে দিলাম। জনবহুল শহরে চলতে গিয়ে তার বয়সী মেয়ে দেখে হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে যেতাম এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নিজের কর্মস্থলে পা বাড়াতাম। পরিচিত কোনো লোক বাড়ি যাচ্ছে শুনলেই দেরি না করে মা-মণির জন্য বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাঠাতাম। বাড়ি থেকে যখন স্ত্রীর চিঠি আসে, অমুকের মারফত দেয়া জিনিসগুলো পেয়েছি তখন কি যে খুশি হতাম তা বলার মতো নয়।

প্রবাসে আসার এক বছর পরের ঘটনা। একদিন দুপুরে আমার ভায়রা আমার রুমে এসে হাজির। চা পর্ব শেষে কথাবার্তার মাঝে তিনি হঠাৎ আমার টেবিলের ওপর থেকে ফটো অ্যালবামটা দেখতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম, তিনি অন্যদের ফটো না দেখে ভেতরের মাঝ বরাবরের মা-মণির ফটোগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন। এক পর্যায়ে ফটোর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞাসা করলেন, সালমার এই ফটোগুলো কবে পাঠিয়েছে।

জবাব দেয়ার পর হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, বাড়ি থেকে আব্বার চিঠি এসেছে। সবাই ভালো। তিনি আপনাদের বাড়িতেও গিয়েছেন। সবাই ভালো আছেন। তবে সালমার নাকি শরীর তেমন একটা ভালো নেই।

পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠিটা কোথায়, একটু দেখান তো!

ভায়রা বললেন, চিঠিটা আনতে ভুলে গিয়েছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

ভায়রা চলে গেলেন। কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না। বার বার চিন্তা করতে লাগলাম তিনি এসেই অ্যালবামে অন্য কারো ফটো না দেখে শুধু মা-মণির ফটো কেন দেখলেন এবং চিঠিতে মা-মণির শরীর খারাপের খবর দিলেন।

নানান টেনশনের মাঝে দিন শেষে রাত এলো। হঠাৎ দেখি আমার বড় ভাগ্নে সিরাজ খন্দকার রুমে এসে হাজির। তার মলিন চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর, কেন এসেছো?

ভাগ্নে সত্য কথাটা গোপন রেখে বললো, বাড়ি থেকে ফোন এসেছে, সালমা নাকি অসুস্থ।

তাকে অভয় দিয়ে বললাম, মিথ্যা বলো না। যেটা সত্যি সেটা বলো। অবশেষে আমার পিড়াপীড়িতে ভাগ্নে সত্যটা বলে ফেললো। সকালে ফোন এসেছে, সালমা কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছে। ওর ডিপথেরিয়া হয়েছিল।

আমার মা-মণির আকস্মিক মৃত্যু খবর শুনে পাথর হয়ে গেলাম। রুম থেকে সবাই যাবার পর অ্যালবামে হাতে নিয়ে মা-মণির ফটোগুলোর প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কতো আদর-যত্ন দিয়ে বড় করে বাড়িতে রেখে এলাম আর শেষ দেখা না দিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেল। চলে গেল বহু দূর। কোনোদিন আব্বুর মাঝে ফিরে আসবে না। কেদেছি। অনেক কেদেছি। মা-মণির অ্যালবাম নিয়ে পরিচিতজনদের বাসায় যেতাম এবং কাদতাম। সবাই সান্ত্বনা দিতেন।

বর্তমানে আমি পাচ কন্যা সন্তানের জনক। বড়টার নাম রেখেছি হারিয়ে যাওয়া মা-মণির নামানুসারে সালমা। আমার মা-মণিদের খুবই ভালোবাসি। দুটোকে বিয়ে দিয়েছি। দুই মাসের ছুটিতে বাড়ি গেলে সবাইকে নিয়ে ছোটদের মতো হই চই করি। আজ পর্যন্ত চোখ রাঙিয়ে মা-মণিদের সঙ্গে কথা বলিনি। তারা শত অন্যায় করলেও তা হজম করে নিই। বিদেশ-বিভূইয়ে একাকিত্বটা ঘোচাই তাদের ছবি দেখে এবং তাদের অজান্তে ক্যাসেটে তোলা মিঠে-কড়া কথাবার্তা শুনে।

এতো কিছুর পরও আমার হারিয়ে যাওয়া মা-মণির ফটো এবং ক্যাসেট এখনো যত্নে রেখে দিয়েছি। ক্যাসেটে তার আব্বু ডাকটা শুনলে চলে যাই সেই স্মৃতির আয়নায়..., বহু দূরে...

শারজাহ, ইউএই থেকে

আবোল- তাবোল

– কবির

সব কিছু ফেলে দিয়ে চলে এলাম প্রবাসে।
দুই হাত ভরে টাকা কামিয়ে বড়লোক হবো নিমেষে।
প্রথমেই যে সমস্যা তাহলো, থাকার জায়গা কোথাও নেই।
কাজের চেয়ে লোক বেশি, কেমন করে একটা কাজ পাই।
টাকা দিয়ে লোকবলে যদিও বা কাজ মেলে।
আধলাখ বেতন পেলেও বেশিটুকু যায় চলে।
স্বদেশ থেকে টাকার জন্য প্রায়ই চিঠি আসে।
টাকা পাঠাও মানিক আমার প্রতি মাসে মাসে।

এমনি করে এক যুগ কাটিয়ে এলোমেলো বেশে,
কালো চুল শাদা করে ফিরে যাবো দেশে।
তারপর বিয়ের জন্য মেয়ে খোজাখুজি।
শাদা চুলে বিলি দিতে মেয়ে নয়কো রাজি।
এই যদি হয় সুখের জীবন দুঃখ তবে কি?
তার চেয়ে স্বদেশ জীবন ভালো নয় কি?
এ রকম সব আবোল-তাবোল ভাবি প্রবাসে,
দুঃখ শুধু বেরিয়ে আসে প্রতি নিঃশ্বাসে।

জাপান থেকে

অনুসুয়া

– অরিন্দম

এক.

ভালোবাসবো বলে ভালোবাসাটা হয়নি, এমনি করেই হয়ে গেছে। বলতে গেলে, এক রকম নির্ভেজাল দুষ্টুমি দিয়েই এর শুরু। আর শেষটা...না, এর বোধহয় কোনো শেষ নেই। আনন্দ-বেদনার ফাল্গুধারা নিয়ে শুধুই বয়ে চলা যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো *পথের শেষ কোথায়, কি আছে শেষে*।

ওকে প্রথম দেখি কলেজে পরীক্ষার হলে, আমি তখন ওদের কলেজের নতুন Lecturer. Love at first sight ! তাই হলো। ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ককে এক লহমায় বদলে দিলাম। কঠিন সিদ্ধান্ত, কঠিন সম্পর্ক এবং সর্বোপরি কঠিন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমার এ আবেগের যুদ্ধ। জানি জয় যতোটা তার চেয়েও বেশি পরাজয়ের গ্লানি। অনেক প্রতিকূলতা, অনেক অপবাদের ভয়ও আমার ইচ্ছেকে বদলে দিতে পারেনি। পরীক্ষার হলে ওই তিন ঘণ্টার দেখা, তারপরে..., তারপরে কেমন করে যেন সময়গুলো দ্রুত ওকে আমার কাছে একেবারে আমার হৃদয়ের নিভৃতে এনে চুপটি করে বসিয়ে দিল। মনকাড়া সুন্দর হাসির জন্য ওকে নাম দিয়েছিলাম অনুসুয়া এবং সে আমাকে ডাকতো অরিন্দম বলে। সেই ক্ষণ সেই স্মৃতি আজও এই প্রবাসে আমাকে তাড়া করে বেড়ায়।

এক দিন, দুই দিন না, দীর্ঘ নয় মাস ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম। কিন্তু পরিচয় দিলাম না। ইচ্ছে করে নয়, ভয়ে। পাছে সে অন্যভাবে আমাকে নিয়ে সব বলে দেয়। কলেজে কি তখন মুখ দেখানো যাবে? আগে তো ওকে আমার বুঝতে হবে, তারপরে না প্রকাশ, প্রথম প্রথম ফোনে পরিচয় না দেয়ায় সে রাগ করতো। ফোন রেখে দিতো। বলতাম, আমাকে মন্দ কথা বা গালিটালি দিও না, সুন্দর করে কথা বলো। না হলে পরিচয় দিলে তুমিই লজ্জা পাবে। পরিচয় না দিলেও তুমি এমনিতেই আমাকে চিনতে পারবে। শুধু সময়ের ব্যাপার। এরপর থেকে সে সুন্দর করে আমার সঙ্গে কথা বলতো। মাঝে মধ্যে সে আমাকে বলতো, আপনি একটা রহস্য।

ওর তখন ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি। টেলিফোনে এ রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরগুলো মুখস্থ নিতাম।

একবার সন্দেহ করে বলেছিল, আপনি কি কোনো কলেজের প্রফেসর–ট্রফেসর নাকি?

আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। বলতাম, আমি তো বিয়ে পাস। বিয়ে পাস করে কেউ কি কলেজে পড়াতে পারে? আরো অনেক ক্লু দিয়েছিলাম তাও ধরতে পারেনি। সন্দেহ হলে বলতো। কিন্তু নিজেকে লুকানোর জন্য যা বলতাম তা বিশ্বাস করতো। আমার গ্রামীণ ফোনের নাম্বারে ফোন করতো, অথচ গ্রামীণ ফোন অফিসে গিয়ে গ্রাহকের নাম জেনে নেয়ার কৌশলটাও ওর মাথায় আসেনি।

একদিন ফোন করে বলেছিলাম, *ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।*

এক লাফে উচ্চস্বরে বলে উঠলো, আপনি আমার প্রোগ্রাম দেখেছেন?

বললাম, কিসের প্রোগ্রাম? জানি না তো, এমনিতেই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি মনে পড়লো। তাই বললাম। ও মেনে নিল। আসলে ওর কথাই সত্যি।

কলেজে বার্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিযোগী হিসেবে সে ওই গানটি গেয়েছিল এবং আমি মঞ্চে আমার আরো তিনজন সহকর্মীর সঙ্গে বিচারক ছিলাম। অনুসুয়া আমার চোখের কাছে, শরীরের অতি কাছের দূরত্বে তার সঙ্গীত পরিবেশন করছে। এবং আমার হাতের কলম দিয়ে আমার ভালোবাসার মানুষটিকে মূল্যায়ন করছি।

কঠিন পরীক্ষা। একদিকে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে ভালোবাসার মানুষটির প্রতি সহানুভূতি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বলতে পারি না অনুসুয়া, তাল, লয়, উচ্চারণ সব ঠিক রেখে গাও, আমি মার্ক দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তুমি তোমার যোগ্যতা দিয়ে আমার কাছ থেকে পুরো দশ নাম্বার নিয়ে নাও। কিন্তু না, সে পারেনি। সহকর্মী এক মহিলা বিচারক আমার দেয়া নাম্বার দেখে বললেন, এতো কম নাম্বার দিলে কেন? মেয়েটা সুন্দরী দেখেও তো তোমার একটু বেশি নাম্বার দেয়া উচিত।

মনে মনে বললাম, ওর এই লোক দেখানো দশ নাম্বারের পুরোটা দরকার নেই। ওকে আমার হৃদয়ের অগণিত নাম্বার দিয়ে দিলাম।

পরীক্ষার ফল বের হলো। আগেই জানি রেজাল্ট কেমন হবে। ঠিক তাই হলো। অনুসুয়ার মন খুব খারাপ। ফোনে অনেক সান্ত্বনা দিলাম। এরপরে তার শুরু হলো নতুন বায়না। আমাকে দেখবে সশরীরে। অনেক অনুনয়, অনেক অনুরোধ। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। এদিকে আমিও দীর্ঘ দিনের আত্মগোপনে হাপিয়ে ওঠেছি। দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের দোলাচলে আমি সিদ্ধান্তহীন। বুঝতে পেরেছি, অনুসুয়া আমার আসল সত্ত্বাকেই সন্দেহ করে রেখেছে। এখন তার শুধু মিলিয়ে দেখার চেষ্টা। কলেজে একদিন এসে এক পিয়নকে পাঠালো আমার মোবাইল ফোনের নাম্বারটা নেয়ার জন্য। মনে হয় সে যে রহস্যকে প্রতিদিন ফোন করে সেই একই ফোন নাম্বার কি না। সবই দেখলাম, সবই বুঝলাম। পিয়নকে নাম্বারটা দিলাম না।

রাতে ফোনে আবারও অনুরোধ আমাকে দেখার জন্য পরিচয় জানার জন্য। ছাত্রী–শিক্ষকের স্বাভাবিক সম্পর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করে আমি অসম সাহসিকতার সঙ্গে ভিন্ন সম্পর্কের ভুবন রচনা করেছি। আমি অনুসুয়াকে মন থেকে ভালোবেসেছি, আপনাকে আপন করে নিতে চেয়েছি। কলেজে একই ধর্মের আরো অনেক সুন্দরী মেয়ে ছিল। কিন্তু অন্য কারো প্রতি আমার কোনো হৃদয়ের দুর্বলতা ছিল না। শুধু কেন অনুসুয়াকেই আমার ভালো লেগেছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজানা।

কারো কারো শারীরিক অবয়ব, কথা বলার ঢং, হাসি কিংবা চোখের দীপ্তি কারো না কারো অন্তরে কখন দোলা দেবে কেউ জানে না। এই দীর্ঘ আত্মগোপনের যবনিকা টানার জন্য অনুসুয়াকে বললাম, তুমি তো আমাকে প্রতিদিন দেখো আবার নতুন করে কি দেখবে? আজকে তাহলে শেষ পর্যন্ত পিয়নকে পাঠালে আমার ফোন নাম্বার মিলিয়ে দেখার জন্য...! শুধু এটুকুই। ব্যস ফোনের ওপাশ থেকে আনন্দের অট্টহাসিতে সে প্রফুল্ল। এখনো এতোগুলো বছর পরেও সে হাসির রেশ আমার কানে দিব্যি প্রাণবন্ত। নয় মাসের সন্দেহটা আজকে প্রমাণিত হওয়ায় সে উচ্ছ্বসিত।

বললো, আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, আপনিই হবেন আমার অরিন্দম।

বললাম, পরিচয় তো জানলে, এখন কি আমাকে ভালো লাগবে।

বললো, লাগবে।

বললাম, তাহলে কালকে দেখা হোক।

তাই হলো।

দিনটি এখনো মনে আছে। ৬ নভেম্বর ১৯৯৭। অনুসুয়া কলেজে এলো। দেখলাম, মন ভরে দেখলাম। মনেই হলো না সরাসরি এই প্রথম আমার অনুসুয়ার সঙ্গে কথা বলছি। চোখে চোখ রাখলাম। বললাম, অনুসুয়া একটা শব্দ করতো। ফোনে এ কথাটি প্রায়ই ওকে বলতাম। এর অর্থটা সে জানে। অনুসুয়া লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তার ঠোঁট দুটো কেপে উঠলো।

বললো! ঢং, আমার বুঝি লজ্জা করে না।

দুই.

হাসিখুশি আর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যে আমাদের তিনটি বছর কেটে গেল টের পেলাম না। প্রথম যুদ্ধে তো জয়ী হলাম, এরপরে রয়েছে দ্বিতীয় যুদ্ধ। অনুসুয়া তার পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে এই দীর্ঘ দিনেও আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আর এদিকে আমার পরিবারের সদস্যরা এ সম্পর্ক মেনে নিতে চায় না। বলে, তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করছো আর তোমার বৌ হবে ইন্টারমিডিয়েট পাস করা একটা মেয়ে?

তাদের অনেক বুঝলাম। ভালোবাসার কাছে এটুকু অযোগ্যতা কোনো দোষের নয়। সংসারে মেজ বোনের প্রাধান্য বেশি। তাকেই বেশি করে বোঝালাম।

একদিন বোনের একটি অপারেশন হলো ঢাকার বারডেমে। বি পজিটিভ রক্তের দরকার। ডা. টি চৌধুরী বললেন, আত্মীযস্বজনের মধ্যে কেউ রক্ত দিলে ভালো হয়। বোনকে রক্ত দিলাম। তার দুই দিন পরে অনুসুয়াকে নিয়ে বারডেমে অসুস্থ বোনের সামনে উপস্থিত হলাম। বোন আমাদের দুইজনকে আশীর্বাদ করলেন। অনুসুয়াকে বললাম, তোমার বাবা-মাকে বলো আমাদের সম্মতির কথা।

অনুসুয়া তার যুদ্ধে হেরে গেল। বিয়ের কথা শুনে আমার সঙ্গে দেখা বন্ধ করে দিল। ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিল। হয়তো বা কিছুটা তার নতুন সিদ্ধান্ত কিংবা কিছুটা তার পারিবারিক সিদ্ধান্ত। অপেক্ষা করলাম। এক মাস পর অনুসূয়া তার সিদ্ধান্ত জানালো আমি অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করতে গেলে সে আমাকে বিয়ে করবে। না হলে নয়।

আমার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের একটি ছেলের কাছে বিদেশ মানেই সোনার হরিণ, বিদেশ মানেই অনেক টাকা খরচ। কখনোই বিদেশের স্বপ্ন দেখিনি। দেশেই খুশি ছিলাম। যা ছিল তাতেই সুখী ছিলাম। অনুসুয়া আমার মনের মধ্যে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন একে দিল। অনুসুয়া আমার পুরুষত্বের ওপর একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। অনুসুয়া আমার নির্ভেজাল ভালোবাসায় শর্ত জুড়ে দিল।

আমার এক বন্ধু বেলজিয়াম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছে। আমাকে সে সেখানে অ্যাডমিশন–এর ব্যবস্থা করে দেয়ার আশ্বাস দিল।

অনুসূয়াকে বললাম, আমি বেলজিয়ামে চেষ্টা করতে পারি।

অনুসুয়া বললো, না বেলজিয়াম–টেলজিয়াম নয়, অস্ট্রেলিয়াতে যেতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি করতে যাওয়ার জন্য নয়, অনুসূয়াকে পাওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি নিলাম। জানুয়ারি ২০০০–এর প্রথম দিকে অনুসুয়ার সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর আবার আরেক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লাম। অনুসুয়াকে বললাম, আমি পারবো অনুসুয়া। তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা অনুসূয়া, আমার সঙ্গেই থাকো, সাহস দাও।

কলেজে চাকরির পাশাপাশি আরো একটি সম্মানজনক চাকরি করতাম। অনুসুয়া জানতো আমি খুবই পরিশ্রমী ছেলে। আমার মতো সেও গান পছন্দ করতো কবিতা ভালোবাসতো কিংবা সাহিত্য, আমাদের দুটো পরিবারই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *কেউ কথা রাখেনি* কবিতাটি খুব পছন্দ করতো অনুসুয়া। আমার কণ্ঠে প্রায়ই আবৃত্তি শুনতে চাইতো। ফোনের এপার থেকে ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি করে ওকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো করে রাখতাম।

নাদের আলী, আমি আর কতো বড় হবো। আমার মাথা এই ছাদ ফুড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপরে তুমি আমায় তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবে। এই লাইনটিকে মাঝে মধ্যে ব্যঙ্গ করে বলতাম, অনুসুয়া আমাদের আর কবে বিয়ে হবে। আমার দুটো চাকরি যখন চারটেয় গিয়ে পৌছাবে তখন তুমি আমায় বিয়ে করবে?

অনুসুয়া খিল খিল করে হাসতো ঝরনার জলের শব্দের মতো হাসির অনুরণন তার কণ্ঠে লেগে থাকতো।

অনুসুয়াকে ভালোবাসা দিয়েছি আর আমাকে তার চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছে। আমার অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি যখন পাকাপোক্ত তখন অনুসুয়া তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো। আমার সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিল। একদিকে অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন লেটার আসে, অন্যদিকে অনুসুয়া দূরে সরে যায়। আমাকে আরেকবার সে ধোকা দিল।

ধীরে ধীরে মনকে স্থির করলাম। ভাবলাম দেশে যতোই প্রিয়জনদের কাছ থেকে কষ্ট পাবো বিদেশে ততোই বেশি মন দিয়ে থাকতে পারবো। এখানকার মায়াটা যতোটা কমবে ততোই মঙ্গল। একই সঙ্গে আমি আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। খুব মনোযোগ দিয়ে এ বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাত্র নয় মাসের প্রস্তুতি। অক্টোবর ২০০০–এর প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাওয়ার ভিসা পাই। হাতে মাত্র আর চার দিন। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এলাম। একই কলেজের খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাত্র এবং সহকর্মী অধ্যাপককে বললাম। তারা চোখের জলে এয়ারপোর্টে আমাকে

বিদায় জানালো। আমি আনন্দ এবং বেদনার দোলাচালে বৃটিশ এয়ারওয়েজে আকাশে উড়লাম। অনুসুয়া জানলো না আমার এই চলে যাওয়া।

তিন.

ভালোবাসার জন্য আমি দুরন্ত ষাড়ের কপালে বাধিনি লাল কাপড় কিংবা *বিশ্ব সংসার তন্নতন্ন করে খুজে আনিনি একশ আটটা নীল পদ্ম*। কিন্তু ভালোবাসার সম্ভ্রম বাচাতে যে শর্ত পূরণ করতে পেরেছি সেটুকুই আমার পরম অহংকার। অনুসুয়াকে সারা জীবনের জন্য বাস্তব থেকে সরিয়ে স্বপ্নে সাজিয়ে রাখলাম।

নিউ ইয়র্কে পৌছেই শেষবারের মতো ফোন করে ওকে বললাম, অনুসুয়া, আমি এখন আমেরিকায়**...**।

আমেরিকা থেকে

গৌরব

– শাহানা আলম

১৯৮২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত দীর্ঘ উনিশটি বছর প্রবাসী ছিলাম। মনে হচ্ছে এই তো সেদিন। কিন্তু মাঝখানে যে অনেকগুলো দিন যে চলে গেছে তা ভাবতেও অবাক লাগে। দীর্ঘ উনিশ বছরের স্মৃতি তো অনেক। কোনটা ফেলে কোনটা লিখি বুঝে উঠতে পারছি না।

প্রথম দশ বছর সউদি আরবের তায়েফ শহরে ছিলাম। অপূর্ব সুন্দর জায়গা যা সমতল ভূমি থেকে ছয় হাজার ফিট উপরে অবস্থিত।

তায়েফ যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের খাজ কেটে যা *রিং রোড* নামে পরিচিতি। সেই রাস্তা পেরোতে লাগে পয়ত্রিশ মিনিট। রাস্তার দুই পাশে পাথরের পাহাড়। আবার কোথাও কোথাও গভীর খাদ বা সব সময় কুয়াশায় আছন্ন থাকে যা দেখলে মনটা ভালো লাগায় ভরে যায়। কালক্রমে চলে এলাম মক্কা এবং জেদ্দায়। নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে সউদির অনেক পরিবর্তন।

প্রথম প্রথম টিভিতে কোনো মেয়ে সংবাদ পাঠক ছিল না। ছিল না, কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন। সব ধরনের অনুষ্ঠান ছিল সরকারের গুণগান করতে। তবে প্রতি রাতে ছিল ইজিপশিয়ান ধারাবাহিক নাটক। টিভিতে কোনোদিন দেখিনি কেনো মেয়েকে (গায়িকা) গান গাইতে, আজও গায় না। কিন্তু আস্তে আস্তে আসতে থাকে মেয়ে সংবাদ পাঠক এবং বিজ্ঞাপন।

তখন কোনো বাড়িতে বারান্দা ছিল না, ছিল না জানালা খোলার কোনো ব্যবস্থা। দিন-রাত লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হতো তাই দিন রাতের পার্থক্য বুঝতাম না। ঘড়ি দেখে নির্ণয় করতাম দিন-রাতের। ওখানকার বাড়ির ছাদ আরো অসহনীয়। আমাদের এখানে ছাদ থেকে ছাদে অনেক প্রেমের জন্ম নিয়েছে। কিন্তু ওখানকার এক ছাদ থেকে অন্য ছাদ দেখা যায় না। প্রতিটি ছাদের দেয়াল মাথার ওপরে।

প্রথম প্রথম এমন পরিবেশে ভীষণ কষ্ট হতো। এখন মন কাদে ওই দেশের জন্য। সামাজিক নিরাপত্তা এতো বেশি ছিল যে, কখনো দরজা–জানালা ভালো করে চেক করে ঘুমাতে হয়নি। যদিও শুনেছি এখন করা লাগে।

রাস্তায় গা ভর্তি গহনা পরে বের হলে কোনো উৎকণ্ঠা নেই, নেই কোনো ডাকাত বা সন্ত্রাসের ভয়। সমুদ্র সৈকত বা অন্য কোনো জায়গা থেকে রাত দুই তিনটায় ফিরতেও কোনো ভয় কাজ করতো না মনে। ওখানকার পার্ক, সমুদ্র সৈকত ও বিভিন্ন রাস্তা এতো সুন্দর করে সাজিয়েছে কৃত্রিমভাবে যা দেখলে চোখ ভরে যায়। মন ভরে না। চোখে ধাধা লাগে। কিন্তু মনে দাগ কাটে না।

এখন সেখানে বাংলাদেশের অনেক কিছুই পাওয়া যায়। শাক–সবজি থেকে শুরু করে ছোট মাছ পর্যন্ত। তখন (১৯৮২–৮৩ সাল) সেসব ছিল খুব দুর্লভ। কতো সময়ে কচুর লতি, ছোট মাছ খেতে মন চাইতো। কিন্তু পেতাম না। স্বামী আমার দুঃখ করে বলতো, কোথায় পাই তোমার জন্য ওই সমস্ত জিনিস।

তখন রাস্তায় কোনো বাঙালি দেখলে মনে হতো সে আমার ভাই, পড়শি বা কোনো আপনজন। কিন্তু আজ ওখানে এতো বাঙালি যার কারণে মাঝে মধ্যে মনে হতো বাংলাদেশে বাস করছি না তো? বেশি বাঙালি যাওয়াতে ওদের মধ্যে আগের সেই ভাতৃত্ব বোধ, মমত্ববোধটার আজকাল প্রায় নেই বললেই চলে। এরা একে অপরকে এড়িয়ে চলে।

জেদ্দা লোহিত সাগরের পাড়ে দাড়িয়ে কতোদিন ভেবেছি। ওদের সেই সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য আমাদের দেশের তুলনায় কিছুই নয়, ওদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে যে আমাদের একটি গণ্ডগ্রামের সৌন্দর্য হার মানবেই এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। কি সুন্দর আমাদের দেশ। কিছু অসুন্দর মানুষের জন্য আমাদের দেশ আজ সৌন্দর্য হারাচ্ছে, হারাচ্ছে তার গৌরব। প্রকৃত সোনার বাংলায় কবে কখন পরিণত হবে আমাদের এই দেশ?

চট্টগ্রাম থেকে

বিদেশিনী ও মুক্তিযুদ্ধ

আজ থেকে এক যুগ আগে এই প্রবাসে এসেছি। বাংলাদেশ প্রকৌশল ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য পাস করা তরুণ কয়েক বন্ধু এই প্রবাসে। সারা দিন কাজ করি আর বিকেলে এখানকার সমুদ্র পার্কে আড্ডা মারি। গাড়ির ক্যাসেটে গান বাজে। পারস্য উপসাগরের নীল জল আর নীলাঞ্জনাদের গন্ধ শুকে বেড়াই। এভাবেই আমাদের অলস বিকালগুলো কাটছিল।

সেদিনও এমনিভাবেই আড্ডা মারছিলাম। গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজছিল। *তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...*। আশপাশে কয়েকটি আরবি পরিবার তাদের পরিজন নিয়ে বৈকালীন ভ্রমণ করছিল। এখানে কেউ কারো দিকে তেমন খেয়াল করে না। সবাই নিজের মতো চলে।

হঠাৎ দেখলাম এক চল্লিশোর্ধ আরবি চেহারার মহিলা আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন এবং গান শোনার চেষ্টা করছেন। প্রথমে ভাবলাম হয়তো অতি উৎসাহী সঙ্গীতপ্রেমিক কেউ হবে।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ গান শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর ধীর পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বাংলাদেশি?

আমরা বললাম, হ্যা।

ক্যাসেটের গানটা তোমাদের, তাই না? গানের সুরটা আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছে, খুব দূর থেকে ভেসে আসা, হৃদয় ছোয়া একটা সুর।

ভদ্রমহিলা ততোক্ষণে আমাদের মুখোমুখি সামনের বেঞ্চে বসে গেছেন যেন আমরা তার অনেক পরিচিত। ভদ্রমহিলা বললেন তার জীবনের গল্প।

আমি মাহা লেবানন থেকে ৭০-এর দিকে টেক্সাস এজেডএম-এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছি। সেখানেই দেখা তোমাদের দেশ থেকে আসা এক উচ্ছল তরুণের সঙ্গে। আসিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তো।

তাকে ভালো লেগেছিল তার ইন্টেলেকচুয়াল কথাবার্তা, সমাজ সচেতনতা এবং জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবনার জন্য। সে তোমাদের দেশের কথা বলতো। মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা বলতো। সেখানকার এক কবির কবিতা আর গান শোনাতো আসিফ।

আমি কথাগুলো বুঝতাম না বলে সে আমাকে অনুবাদ করে শোনাতো। যে গানটা এখনই বাজছিল তার মানে আমি জানি। You live in my heart silently forever, like a full moon night.

এভাবেই আমি আর আসিফ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। মার্চে যখন তোমাদের ওখানে যুদ্ধ শুরু হলো তখন আমরা দুজনা মিলে ফ্ল্যাগ বিক্রি করে রিফিউজিদের পাঠিয়েছি।

সে আমাকে ম্যাডিসন স্কোয়ারে *কনসার্ট ফর বাংলাদেশ*-এ নিয়ে গিয়েছিল। জর্জ হ্যারিসনের গান শুনে আমি কেদেছিলাম।

নভেম্বরের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন রাতে সে আমাকে ফোন করে বললো, কালই দেশে ফিরে যাচ্ছি। কবে দেখা হবে জানি না। দোয়া করো যেন ভালোভাবে ফিরে আসতে পারি।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ওখানকার টিভিতে দেখলাম তোমাদের উল্লাস। হাজারও জনতার ভিড়ে খুজলাম আসিফকে। ভাবলাম সে হয়তো এবার ফিরে এসে পড়াশোনা শেষ করবে। সে আর এলো না ক্যাম্পাসে। আমি পড়াশোনা শেষ করে চুয়াত্তরের শেষে দেশে ফিরে গেলাম। সঙ্গে নিয়ে গেলাম আসিফের দেয়া তোমাদের *গীতাঞ্জলি*-র অনুবাদ।

কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার গলা ধরে আসছিল। চোখের কোণে জল, লাল সূর্যটা আজ যেন বেশি রকমের লাল। উপসাগরের ঢেউ কূলে আছড়ে পড়ে। তার ছন্দে আমরা আবার বর্তমানে ফিরে আসি। ক্যাসেটে তখন বাজছে, *যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...*।

ভদ্রমহিলা বললেন, এই গানটাও আমার খুব পরিচিত। আসিফ প্রায়ই গাইতো।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

কিন্তু আমাদের বলা হলো না, আসিফ রক্ত দিয়েছিল বলেই এই সুদূর প্রবাসে আমরা রবীন্দ্রনাথের গান শুনছি। বাবার চিঠির ঠিকানায় লিখতে পারছি বাংলাদেশ।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মন্ত্রীদের প্রতি অনুরোধ

– মোহাম্মদ রেজাউল করিম

বর্তমানে মরু সাহারার লিবিয়ান ভাগে পশ্চিম দক্ষিণ অংশে আলজেরিয়ান সীমান্তের কাছে গ্যাস খনি নির্মাণের কাজ করছি। এখানে আমরা প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি, পাচশ পাকিস্তানি, দেড়শজন ফিলিপিনো, দেড়শজন থাই, সাড়ে তিনশ কোরিয়ান, পনেরো বিশজন লিবিয়ান, দুই চারজন সুদানিজ এবং কিছু সংখ্যক জাপানিজ এবং ইটালিয়ান কনসালটেন্ট হিসেবে আমাদের কম্পানি দেউ–র কাজ তদারকি করছেন।

গত ১১ নভেম্বর সকাল এগারো ত্রিশ মিনিটে এমিরেটস–এর বিশাল বিমানে করে আমরা একই কম্পানির পঞ্চাশজন লোক ঢাকা জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ছাড়ি। দুবাই এয়ারপোর্টে এক রাত, ইওরোপের মালটায় এক ঘণ্টা বিরতির পর ১৩ তারিখ বিকাল সাড়ে চারটায় লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি এয়ারপোর্টে পৌছাই। ওইখানে একদিন রাখার পর ১৪ তারিখ সকাল পাচটায় আমাদেরকে বাসে ওঠানো হয়। দুপুর দুইটা বাস থেকে নামিয়ে ট্রাকে ওঠানো হয়। পরিবর্তন করার কারণ হলো, ভাঙা রাস্তা দিয়ে বাস যাবে না। তাই ড্রাম ট্রাকের পেছনে করে যেতে হবে।

চারটা ড্রাম ট্রাক একটার পেছনে আর একটা ড্রাম ট্রাকের ঝাকুনি এবং চাকার উঠানো বালি, তার উপরে হালকা মরু হাওয়ার উড়ানো বালিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চেহারার অন্যরূপ লাভ করে। অর্থাৎ কথা ছাড়া চেহারা দেখে একজন অন্যজনকে চেনার উপায় নেই।

এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রমজানের ইফতারের সময় ছুই ছুই। আমাদেরকে ট্রাক থেকে নামানো হলো। হাত মুখ ধুয়ে ইফতার করলাম। এরপর পঞ্চাশজনে ভাগ করে বিভিন্ন রুমে সিট দেয়া হলো। পুরনো আটজনের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। এখানে এসে জানলাম চব্বিশ লাখ বর্গ কিলোমিটারের এই বিশাল সাহারার নানান রূপের খবর। শীতে কনকনে শীত, হিমাংকের নিচে আট দশ পর্যন্ত। গরমে কাঠ ফাটা রোদ। ষাট পয়ষট্টি সেলসিয়াস। নেই কোথাও গাছ–পালা, পশু–পাখি, বন–জঙ্গল, পুকুর–নদী। শুধু তা নয়, চারশ পাচশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ঘর–বাড়ি বা জনবসতি পর্যন্ত নেই।

আমরা ত্রিপোলি থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে (WAFA) ওয়েস্টার্ন লিরিয়া গ্যাস প্রকল্পে কাজ করছি। এখানে ধূ ধূ মরুভূমি, বালি আর মাটি। সামান্য হাওয়াতে মিনিটের মধ্যেই আল্লাহর দেয়া আপনার সুন্দর চেহারা হয়ে যাবে বিবর্ণ। আমরা যখন কাজে যাই তখন ভোর ছয়টা। সকাল সাড়ে আটটায় সূর্যের মুখ দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকায় সূর্য উঠতে এবং অস্ত যাওয়ার দৃশ্য ভালোভাবে দেখা যায়।

কাজে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। মাথায় হেলমেট লাগাতে হয়। পায়ে সেফটিজুতো, নাক–মুখে গ্যাস মাস্ক বা বায়ুরোধক লাগাতে হয় এবং চোখ জোড়া ঢাকতে হয় সেফটি গ্লাস কিংবা নিরাপদ চশমা দিয়ে। এখানে শীত এবং গরমে মোটা কাপড়ে প্রস্তুতি নিতে হয়।

শীতে কমপক্ষে দুই জোড়া মোজা, চার পাচটা মোটামুটি জামার ওপরে একটা মোটা কাপড়ের জ্যাকেট, দুটো প্যান্ট আর কুদ্দুসভাইয়ের মতো ঠাণ্ডাকে ভয় পেলে চারটা বা পাচটা লাগাতে পারেন। হাতে দুটো করে হাত মোজা, মোটা কাপড় দিয়ে কান–মুখ ভালোভাবে বাধতে হয়। গরম অথবা ঠাণ্ডার হাত থেকে বাচার জন্য এবার একবার আয়নার সামনে দাড়ান।

শুধু চোখের জায়গাটা ফাক রাখলেই হবে। হ্যা, এবার শত চেষ্টা করেও নিজেকে চেনার কোনো উপায় নেই। হয়তো স্ত্রীও চিনবে না এই সে ব্যক্তি যার সঙ্গে রাতের পর রাত এক বিছানায় কাটিয়েছি। এখানে আমাদেরকে প্রতিটা কাজে লাইন দিতে হয়। দৈনন্দিন জীবন শুরুর প্রথম পর্ব টয়লেট, মুখ ধোয়া বা গোসল এখানে লাইন। সকালবেলা নাশতা বাঙালির জন্য ভাত, এখানে লাইন। কাজে যাওয়ার জন্য বাস এখানেও লাইন। বাস থেকে নামতে অবশ্যই লাইন। কারণ দুই তিনজন তো আর এক সঙ্গে নামা যায় না! সুতরাং লাইন। সারা দিন এভাবে লাইনে চলার পর রাতে ঘুমের পালা, এবারও লাইন। কারণ রুমগুলোর মধ্যখানে দরজা রেখে সোজা পথ, দুইপাশে দুটি বড় চকি লম্বালম্বি করে বানানো। এর ওপর চার পাচজনের বিছানা পাতা। মাঝের দিকে পা দিয়ে দুই দিকে মাথা। সুতরাং লাইন।

মাস পেরোলে পে–রশিদ, এখানেও লাইন। পে–রশিদ নিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠাই। উত্তর আসে টাকা পৌছায়নি। কারো পাচ মাস আবার কারো ছয় সাত মাস, এখনো টাকা পৌছায়নি। কেন!

কোরিয়ান অ্যাডমিনকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলে, আমরা পাঠিয়েছি। তোমাদের দেশের ব্যাংকে যোগাযোগ করো।

কোন ব্যাংকে?

সোনালি ব্যাংকের ওয়েজ আর্নার ব্রাঞ্চ যেখানে এফসিএডি খোলা হয়েছে।

কেন যোগাযোগ করতে হবে?

যেখানে অর্থমন্ত্রী দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে বলছেন, আপনারা ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠান, বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আপনার টাকা পৌছে যাবে আপনার নমিনির কাছে সেখানে কেন এতো বিলম্ব? একজন শ্রমিক বিদেশ যাওয়ার জন্য যেখানে সরকার নির্দিষ্ট ফি ধার্য করে দিয়েছে সেখানেও কমপক্ষে এক লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। কেউ কেউ দালালকে অতিরিক্ত ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা বেশি দিয়ে আসছে। এখানে এসেও দেখা যায় একজন বাংলাদেশি শ্রমিক যেখানে সত্তর সেন্ট পায় সেখানে একজন ফিলিপিনো প্রায় দুই ডলার প্রতি ঘণ্টায়। এই অবস্থায় শ্রমিকদের মন ভেঙে যায়। দেশের প্রশাসন এবং ম্যানপাওয়ার এজেন্সির প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়। এরপর দেশে টাকা পাঠানোর মধ্যে চলতে থাকে অনিয়ম। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেরই বাড়িতে করুণ অবস্থা। অথচ ব্যাংকে টাকা গেলেও শাখা ব্যাংকগুলোতে টাকা পাঠানো হয় না। অনেক শ্রমিকেরই দেশে তেমন কেউই থাকে না ব্যাংকে গিয়ে খবর নেবে। কিন্তু তাদের সংসারের করুণ অবস্থা।

সুতরাং আমার প্রশ্ন, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? যার কেউ আছে, ব্যাংকে গিয়ে খবর নিচ্ছেন তাদেরকে কিছু না কিছু খরচ করতে হয়। যদি খরচ না করে তাহলে নাকি শাখা ব্যাংকে টাকা যেতে দেরি হবে। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদেশে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী

কেন বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশে দেশে হন্যে হয়ে ঘুরছেন এবং বিদেশিদের কাছে নিজেকে, দেশকে, জাতিকে ছোট করছেন।

আমার অনুরোধ। এসব অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারীকে আগে ঠিক করার ব্যবস্থা নিন যারা একদিনের কাজ তিন মাসেও শেষ করছে না। ওই সব ম্যানপাওয়ার এজেন্সি ও দালালকে শায়েস্তা করুন যারা অতিরিক্ত চার্জ নিচ্ছে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদেরকে প্রতারিত করছে।

একটা কথা না বললেই নয়। লিবিয়া একটি মুসলিম দেশ। এ দেশে লোকসংখ্যা মাত্র সত্তর লাখ। বেকার সংখ্যাও কম নয়। তবুও তারা বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের সঙ্গে এ দেশের সম্পর্কও ভালো। কিন্তু ব্যাংকিংয়ের দিক থেকে যোগাযোগ উন্নত নয়। মন্ত্রীদ্বয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমাদের সঙ্গে মাত্র দেড়শজন ফিলিপিনো। এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ দেড়শজন শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য তাদের রাষ্ট্রদূত দুই দুবার WAFA-তে এসে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে যান। অথচ আমাদের শ্রমিকদের শত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কোনো দূতাবাসকর্মী এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার খোজ নিয়েছেন এমন কিছু আমার জানা নেই।

আমি সামান্য একজন শ্রমিক হয়ে মন্ত্রীদেরকে উপদেশ দেয়ার সাহস দেখাবো না। শুধু অনুরোধ জানাবো, জাতিকে রক্ষার জন্য একটু এগিয়ে আসুন। এখানে বাংলাদেশ থেকে আরো চারশ পাচশ শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হবে। তবে মাত্র ছয় সাত মাসের জন্য এই অবস্থায় এক লাখ টাকা খরচ করে এসে শ্রমিকের আসল টাকা উঠানোই মুশকিল হবে। এদিকে নজর দেয়ার জন্য অনুরোধ রইলো।

লিবিয়া থেকে

ফেরারি

১৯৯৭ সাল। বড় একটি দুর্ঘঘটনা ঘটে গেল আমার জীবনে। অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে নতুন জীবনের প্রত্যয়ে এগিয়ে চললাম। সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের দ্বিতীয় প্রকৌশলী পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকা থেকে লন্ডন-মাল্টা হয়ে ইটালিতে এসে যোগদান করলাম জাহাজে। তেলবাহী ট্যাংকার। সহকর্মীদের মাঝে চতুর্থ প্রকৌশলী এবং থার্ড অফিসার বাংলাদেশি। ক্রুদের মাঝে বেশির ভাগ বাংলাদেশি। বাকি সবাই লিবিয়ান এবং ইনডিয়ান।

এক মাসের মাথায় টেলিফোনে জানতে পারি দুঃসংবাদ। দুর্ঘটনাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত অপরপক্ষ আমার মা, ভাই এবং আমাকে আসামি করে যৌতুক নিরোধ আইনে মিথ্যা মামলা করেছে। মা, ভাই চট্টগ্রামে পালিয়ে আছেন। মায়ের কষ্টের কথা ভেবে চোখে এলো অশ্রু, গড়িয়ে পড়লো টেলিফোন বুথ বেয়ে ইটালির রাজপথের ফুটপাথে।

মা আশ্বস্ত করলেন, তদবির হচ্ছে হাই কোর্টের মাধ্যমে জামিনের।

পরম করুণাময়ের কৃপায় জামিন হতেও পারে। কিন্তু দেশে যে কি ঝড় বইছে মা, ভাইয়ের ওপর তা আচ করতে সামান্য কষ্টও হয়নি আমার। আইনকে সম্মান করি। এখন দেশে এলে তিন চার বছরের জন্য আটকে যাবো এবং ক্যারিয়ার স্থবির হয়ে যাবে।

মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সবাই বললেন, যতোদিন সম্ভব দেশের বাইরে থাকো তুমি।

শুরু হলো আমার ফেরারি প্রবাস জীবন।

টেলিফোনে খবর নিই বার বার। মাস দেড়েক পর মা, ভাইয়ের হাই কোর্ট থেকে জামিনের সুসংবাদটি পেলাম। আমার জন্য আবেদন করা সম্ভব হয়নি যেহেতু আদালতে উপস্থিত ছিলাম না। সময় গড়াতে থাকে। জাহাজের কাজে জনৈক বৃটিশ নাগরিক (নিষ্ক্রিয় গ্যাস বিশেষজ্ঞ)-এর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাকে নগদ টাকা দিয়ে অনুরোধ করলাম South Tyneside College-এ ক্লাস ওয়ান মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা করতে। তিনি তা করলেন এবং আমি অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট পেয়ে যাই।

এদিকে আমার চাকরির চুক্তির সময় নয় মাস ফুরিয়ে আসছে। দেশে ফেরা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডে যাওয়া যেতে পারে। তবে ভিসা নিতে হবে।

ত্রিপোলি বহির্নোঙ্গরে জাহাজ। আমার অব্যাহতি হয়ে গেল চুক্তির মেয়াদ শেষে। ত্রিপোলি-র সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিমান যোগাযোগ ছিল না তখন। তাই যাত্রীবাহী জাহাজে মাল্টায় এলাম। মাল্টায় ইউকে ভিসা না পেলে দেশে চলে আসতে হবে। দেশে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আইন এবং হাতকড়া। টেনশন বেড়ে চলছে। ইমিগ্রেশন, কাস্টমস শেষে মাল্টায় পা রাখতে সময় হয়ে গেল এগারোটা। এখানে একদিনের ভিসা দেয়া হয়েছে আমাকে। ট্যাকসি নিয়ে রওনা হলাম বৃটিশ হাই কমিশনের দিকে। ট্যাকসি চলছে দ্রুতগতিতে। দুপুর বারোটায় বৃটিশ হাই কমিশন বন্ধ হয়ে যায়।

আসতে আসতে পাচ মিনিট বাকি বারোটার। পাগলের মতো ছুটে কোনো রকমে ঢুকে পড়লাম সেখানে। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় বৃটিশ ভিসা পেয়ে যাই। মাল্টা থেকে লন্ডন হয়ে South Shields-এ আসি।

দেশে মামলা চলছে। প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ, তীব্র শীত, অদৃশ্য মানসিক অস্থিরতা এসব নিয়ে শুরু করলাম জীবনের এ অধ্যায়টি। সিরিয়াসলি পড়াশোনা করলাম। পাসও করলাম সময় মতো। পরীক্ষা শেষে রেজাল্টের আগে মাস খানেক কোনো কাজ নেই। এ সময় প্রায়ই ডিসকোথেক যেতাম। স্যাটারডে নাইট, মিলেনিয়াম নাইট উপভোগ করেছি। অনেক ড্রিংকও করেছি। মিউজিকের তালে তালে নিজেকে দুলিয়েছি। কিন্তু কেউ জানেনি আমি মিউজিক বিটের সঙ্গে নিজেকে কখনো দোলাইনি, উপশম করেছি প্রতি মুহূর্তের অস্থিরতার, পালিয়ে বেড়াচ্ছি স্বদেশ থেকে নিত্যদিন।

ইংল্যান্ড থেকে মোনাকো-র একটি কম্পানিতে সেকেন্ড ইনজিনিয়ারের পদে যোগদান করি। এখানে আমি প্রথম বাংলাদেশি। বাকিরা সবাই ইনডিয়ান এবং ইটালিয়ান। কাজে যোগদানের দিন সবাই আমাকে দেখতে এসেছিল। কারণ তারা আগে কোনো বাংলাদেশিকে দেখেনি।

এখানে ইনডিয়ানদের সঙ্গে বেশ মজার কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের প্রশ্ন, বাংলাদেশে আপনি নিশ্চয়ই খুব ধনী লোক।

হেসে বললাম, আপনি কি ইনডিয়ার ধনী লোক? আমার দেশে কোটিপতি ধনীদের অভাব নেই। আমি একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত মাত্র।

সেকেন্ড অফিসার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি একজন ফর্শা, হ্যান্ডসাম, লম্বা যুবক, অথচ ফিল্মের হিরো হলেন না কেন? বাংলাদেশে কি ফিল্ম তৈরি হয় না? ফিল্ম ইনডাসট্রি কি আদৌ নেই?

উত্তর দিলাম, সবই আছে। তবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার না হতে পারলে ফিল্ম হিরো অবশ্যই হতাম।

সবাই হাসলো।

কথা প্রসঙ্গে একদিন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা উঠলো। অবাক হলাম বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা দেখে! সংক্ষেপে তাদের ধারণা বাংলাদেশ একান্তই গরিব দেশ। ঢাকায় বড়জোর দশ লাখ লোকের বসবাস। রাস্তাঘাট বেশির ভাগই কাচা। ঢাকায় ইমারত সর্বোচ্চ ছয় তলা। দেশটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ে জর্জরিত। এবং দেশটিতে দুই মহিলার ঝগড়া সারা বছরই চলে।

পাল্টা জবাব দিয়ে ইনডিয়ানদের ধারণা পরিষ্কার করলাম এবং দেশে আমন্ত্রণ জানালাম দেখার জন্য।

ক্যাপটেন একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দেশে চিফ মিনিস্টার কতো বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন?

খুব গায়ে লাগলো আমার। রিঅ্যাক্ট করলাম, আপনি কি জানেন না একটি স্বাধীন দেশে প্রাইম মিনিস্টার হয়, চিফ মিনিস্টার নয়।

আরেক দিন কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের সুবিধা আছে কি না এবং থাকলে বিল কতো।

বললাম, সাত টাকা প্রতি মিনিটে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার দেশের মানুষের এতো টাকা আছে যে প্রতি মিনিটে সাত টাকা দেয়! ইনডিয়ায় দুই টাকা মাত্র।

ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার মধ্য বয়স্ক। তিনি ইনডিয়ান নেভি থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, আমি ১৯৭১-এ বাংলাদেশে যুদ্ধ করেছিলাম চট্টগ্রাম বন্দরে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, বেশির ভাগ বয়স্ক ইনডিয়ান লোক যারা নেভি থেকে এসেছেন তারা সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে যুদ্ধ না করেও বাংলাদেশিদেরকে এ কথাটি বলে থাকেন।

যাহোক, এগারো মাস কেটে গেল। আমি চিফ ইনজিনিয়ার প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পেলাম। ইনডিয়ান ক্যাপটেন যাওয়ার পর ইটালিয়ান ক্যাপটেন এলেন। জাহাজ ডেনমার্ক-আমেরিকা রুটে দুটো ভয়েজ করলো। টানা তিন বছর দেশের বাইরে আমি। অসহ্য হয়ে উঠছে ফেরারি এ প্রবাস জীবন। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম, দেশে চলে আসবো।

জার্মানি থেকে দেশে রওনা হলাম সুইস এয়ারে। বম্বে-তে আসার পর এরোফ্লটে ঢাকা এলাম। এয়ারপোর্টে পরিবারের সবাই সতর্ক প্রহরায় ছিলেন। নিঃশব্দে দেশে প্রবেশ করলাম। প্রবাস জীবনের অবসান হলেও আমি ফেরারি। ওই দিনই চট্টগ্রাম চলে যাই। হাই কোর্টে জামিনে আবেদন করি। নোয়াখালির আদালতে মামলা চলছিল। জামিনে মুক্ত হই। মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে খারিজ হয়ে যায় এক সময়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

দেখে শুনে বুঝে আসুন

– ওসমান গনী সেলিম

মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট দেশ কুয়েত প্রবাসীদের পরিমণ্ডলে আজ কিছুটা আলোকপাত করবো। আমরা প্রবাসীরা আশা করবো, কুয়েতের মতো বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের প্রত্যেকটি সমস্যা সরকার আমলে আনবে। সরকার যদি মনে করে, এর মধ্যে জাতীয় তথা অর্থনৈতিক সার্থকতা নিহিত রয়েছে তাহলে সুবুদ্ধির পরিচয় বহন করবে।

কুয়েতের আট দশটি ক্লিনিক কম্পানির ম্যানপাওয়ার দোকান নিয়ে প্রতিযোগিতায় আছে আমাদের নিজ দেশীয় কয়েকজন আদম ব্যবসায়ী। মানুষকে কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করা একটি মানবিক তথা সম্মানজনক কাজ। এ সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য এ আদমের দালালরা আমাদের কাছে সম্মানের পরিবর্তে লোভনীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনায় অত্যধিক ঘৃণার পাত্র। আমরা সর্বসাধারণ এ জন্যই তাদের ধিক্কার দিই। কারণ নিজেদের পকেট ভারী করা তথা ভিসা বিক্রির লোভে নামমাত্র বেতনে অপেক্ষাকৃত কম দামে ভিসা (দুই পাতা কাগজ) ক্রয় করে চড়া দামে, অনেক ক্ষেত্রে ডাবলে তা বিক্রি করে। এসব দালালদের অনেকের না আছে কোনো বৈধ ম্যানপাওয়ার লাইসেন্স আর না আছে কোনো লেখাপড়ার অভিজ্ঞতা।

অনেকে আবার ভালো চাকরির পাশাপাশি শিক্ষিত পণ্ডিত হয়েও এমন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। আমরা এসব দালালদের ঘৃণা করতাম না যদি তারা সর্বনিম্ন (আঠারো দিনার) বেতনে লেবার সাপ্লাই না দিতো, ডাবল দামে বিক্রি না করতো, ভিসা বিক্রয় উত্তর শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে মালিকদের সঙ্গে ডিল করতো।

যতোটুকু জানি জনশক্তি মন্ত্রণালয় থেকে পয়ত্রিশ দিনার বেতনের নিচে কোনো ওয়ার্ক পারমিট ছাড়পত্র দেয়ার বিধান নেই। কিন্তু আমাদের দালালদের নিজস্ব স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তদবির ও লবিইংয়ের মাধ্যমে ছাড়পত্র নিতে কোনো সমস্যা হয় না। যেখানে পয়ত্রিশ দিনার উল্লেখ থাকলেও বস্তুত শ্রমিকরা আঠারো দিনার, তারও কম পায়। তা আবার চার পাচ মাসেও পাওয়া যায় না। শুরু হয় বিদেশে দুর্বিষহ জীবন। বেতনের জন্য আন্দোলনে নামতে হয়। ফলে অনেককে মালিকপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে দেশে ফেরত পাঠায়।

অথচ পয়ত্রিশ দিনার বেতনেও আমাদের পার্শ্ববর্তী ইনডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকার ম্যানপাওয়ার ক্লিয়ারেন্স সরকার দেয় না। আর কর্মকর্তারাও দুর্নীতির মাধ্যমে ক্লিয়ারেন্স পেতে সহযোগিতা করে না। আমাদের দালালদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ নেই বলে ব্যক্তিস্বার্থে যতো কিছুই করে। পরে পার পেয়ে যায়।

কুয়েতে বাংলাদেশি শ্রমবাজার এমন নিম্ন পর্যায়ে এসে দাড়ানোর জন্য আমাদের দালালরাই দায়ী। ব্যাপারটা এমন যেমন A হলো একটি কম্পানি। তাদের তিনশ লোকের চাহিদা রয়েছে। B গিয়ে চুক্তি করলো পয়ত্রিশ দিনার বেসিক বেতনে আমি লেবার সাপ্লাই দেবো। এ জন্য প্রতিটা ভিসার পরিবর্তে দুইশ দিনারে চুক্তি হলো। C ব্যাপারটা জানতে পেরে গোপনে A-কে বললো, আমি তোমাকে ত্রিশ

দিনারে লেবার দেবো এবং দুইশ দশ দিনার করে দেবো। পরে D এগিয়ে গিয়ে অন্য সুরে বললো, আমি পচিশ দিনারে দুইশ বিশ দিনার চুক্তিতে রাজি আছি। এই নাও আমার বায়নার টাকা। এমনিভাবে বেতন ও ভিসার দামের ধাক্কাটা সাধারণ লেবারের ওপর গিয়ে পড়ে।

আরেকটি সমস্যা না বললেই নয়। এ ভিসা বিক্রি করার সময় দালালরা বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা ও আউট ইনকামের লোভ দেখিয়ে আরো এক ধাপ ভিসার দাম বাড়াতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু বাস্তবে শতকরা পাচজনেও সে সুযোগ পায় না। যারা পান তারা আবার আসার পরে কম্পানির বাঙালি ফোরম্যানদের টাকা দিয়ে সে সুবিধা নিতে হয়।

এক সময়ে কুয়েতে ভিসার জন্য কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হতো না। আমাদের দালালরাই সব শিখিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার একটু সচেতন হলেই সারা বিশ্বে জনশক্তি রফতানির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বৈধ লাইসেন্সধারী ম্যানপাওয়ারগুলোর মাধ্যমে দেশ ভিত্তিক একটি নির্ধারিত বেতন স্কেলের আওতায় জনশক্তি রফতানির ব্যবস্থাত্তর প্রত্যেক দূতাবাস কর্তৃক শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি অবজারভেশন সিসটেম থাকলে বস্তুত সরকারই বেশি ভালো লাভবান হতো।

বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোনো দেশে বা কম্পানিতে শ্রমিক সরবরাহ করার পর শ্রমিকের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির কোনো পরিবর্তন বা হেরফের হলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে তার দেখভাল করা।

আমাদের কুয়েত প্রবাসী আদম বেপারীদের বলছি, আপনারা কম বেতনে বাংলাদেশে থেকে লেবার সরবরাহ করবেন না। মানব জীবন উৎকৃষ্ট জীবন। একে পরকল্যাণে ব্যয় করুন। আপনারা শক্ত হলে কম্পানির মালিকরা বেতন স্কেল বাড়াতে বাধ্য হবে।

পাঠকদের বলছি, দেশে আপনারা নিজেরা অথবা আপনজনদের সাবলম্বী হতে সহযোগিতা করুন। কুয়েতে তথা মধ্যপ্রাচ্যে আগের মতো শান্তি নেই। তারপরও যদি আসতে চান তাহলে ভিসা হাতে পেলে যাচাই-বাছাই করে দেখুন। কুয়েতে দুই একটি ক্লিনিক কম্পানি ছাড়া কোনো কম্পানিই মাসে মাসে বেতন দেয় না। হাতেগোনা দুই একটি কম্পানির বেতন মাত্র বিশ পচিশ দিনার। আর সব আঠারো দিনার। আপনারা দালালদের খপ্পরে পড়বেন না। আর পাচ পারসেন্ট শ্রমিকও বেতনের বাইরে আউট ইনকাম করতে পারে না বৈধভাবে। যাদের পুরনো আত্মীয়স্বজন আছে তারাই কেবল সে সুবিধা পায়। তবে ব্যক্তি ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

ছালমিয়া, কুয়েত থেকে
osman_ob@reddifmail.com

ভাত ও মাছ

– জুয়েল

১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে জীবিকার সন্ধানে মরুভূমির দেশ সউদি আরবে আসি। আমার কর্মস্থল ছিল রিয়াদ থেকে সাতশ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট শহরের একটি ছোট সুপার মার্কেটে। সেখানে

ভোর ছয়টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। আর এই সময়ের মধ্যে দুপুরে মাত্র এক ঘণ্টার বিরতি দেয়া হতো। এই এক ঘণ্টায় রান্না, গোসল, খাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতো না। এখানে মাছ না পাওয়া গেলেও মুরগি পাওয়া যেতো। কিন্তু মুরগি ও ভাত রান্না করার সময় কোথায়! তাই দুপুরে ডিম ভেজে রুটি দিয়ে খেতাম এবং রাতে মাখন অথবা দই দিয়ে রুটি খেতাম।
শুধু বৃহস্পতিবার রাতে ভাত রান্না করতাম এবং দুই বেলা খেতে পারতাম। কারণ শুক্রবার সকালে নয়টায় দোকান খোলে আবার জুম্মার নামাজের জন্য সাড়ে দশটায় বন্ধ করা হতো। এভাবে ছয় মাস কাটিয়েছি শুধু সপ্তাহে দুই বেলা ভাত খেয়ে।
এর মধ্যে এমনো অনেক দিন গেছে যখন ঘরে খাবার মতো কিছুই নেই শুধু দুপুরের দুটি রুটি আছে তখন ক্ষিধের জ্বালায় পেয়াজ কুচে তেলে ভেজে রুটি দিয়ে খেয়েছি। সেই সময় প্রায় রাতেই একটা স্বপ্ন দেখতাম। আমার মায়ের হাতের রান্না করা ইলিশ মাছ দিয়ে আলু-বেগুনের তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছি অথবা আমার খালার হাতের প্রেশার কুকারে রান্না করা গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছি।
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই চাকরি ছেড়ে রিয়াদে এসে বর্তমানে ভালো চাকরি করছি। এখন প্রায়ই ফ্রায়েড চিকেন দিয়ে ডিনার করি। কিন্তু আমার দেশের সেই ইলিশ মাছ ও ভাতের জন্য মনটা অতৃপ্ত থেকে যায়। তাই তো আমরা ভাতে-মাছে বাঙালি।

আভা, সউদি আরব থেকে

মূল্যায়ন

– রেজা মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ

আগামীকাল সকালে অর্থাৎ খুব ভোরে বৃটিশ এয়ারওয়েজ-এর ফ্লাইটে আরিফভাই ঢাকা আসছেন। আজ আরিফভাই ফোন করে এ কথা জানিয়েছেন। আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি আরিফভাই হঠাৎ করে চলে আসবেন। আমি তখন ঢাকাতে চাচার ওখানে থাকার কারণে খুব মজা করতে পারি। আমরা সবাই মজা করলেও চাচি ছিলেন খুবই চিন্তিত। কারণ আরিফভাই একা আসছেন না, আসছেন তার সঙ্গে একজন বৃটিশ মেয়ে। ওই মেয়েটার সম্পর্কে চাচি ফোনে জিজ্ঞাসা করতে গেলেই লাইন কেটে যায়। তারপর থেকে চাচির চিন্তার মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকছে।
আমি সব কিছু জানার পরও চাচিকে রাগানোর জন্য বললাম, কাল তোমার ছেলে আসছে, আর তুমি মন খারাপ করে বসে আছো কেন বলোতো।
চাচি খেপে গিয়ে বললেন, কেন জানিসনে, তোর ওই গাধা ভাইটার ঘাড়ে ঝুলে একটা বাদর আসছে, তাই। তারপর বললেন, কি জানি রে, পাগলটা শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়েই করে না আনে! যদি বিয়ে করে ফেলে তবে সবার সামনে কি করে মুখ দেখাবো। এ জন্যই আমি ওকে বিদেশে যেতে দিতে চাইছিলাম না। কারণ আমি জানি, ওখানে গেলেই আমাদের দেশের ছেলেরা বিদেশি মেয়েদের বিয়ে করে।

চাচিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, চাচি শোনো, এতো দুশ্চিন্তা করো না, আরিফভাইয়া এলে তার কাছ থেকে আগে জেনে নিও। কারণ আমরা তো কোনো কিছুই জানি না ওই মেয়েটি সম্পর্কে। তাই না জেনে কোনো কিছু বলা ঠিক নয়।

আরিফ আমার চাচাতো ভাই। বুয়েট থেকে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি অনার্স করার পর স্কলারশিপ নিয়ে গেছেন লন্ডনের একটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে।

পরদিন সকালে আরিফভাই এলেন। আমরা গিয়েছিলাম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এগিয়ে আনতে। চাচি যখন জানতে পারলেন, আরিফভাই তাকে বিয়ে করেনি তখন হাপ ছেড়ে বাচলেন। আসলে মেয়েটি ছিল আরিফভাইয়ের সহপাঠী, এসেছে বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে।

মেয়েটার নাম কৃস্টিনা। বাসা লন্ডন শহরে। অভিজাত পরিবার। ইংরেজ হলেও আসলে কৃস্টিনাকে পুরো ইংরেজ বলা যাবে না। ওর দাদির আম্মা সম্ভবত ইনডিয়ান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাই ওর চুলগুলো কালো। কিন্তু চামড়া শাদা। লম্বাতেও পাচ ফিট চার পাচ ইঞ্চি হবে। বলতে গেলে লম্বা-চওড়া বাঙালি মেয়েদের মতো। আমাকে কৃস্টিনা খুবই পছন্দ করতো। আমি আর চাচাতো বোন বন্যা প্রথম দিন থেকেই ছিলাম তার অঘোষিত সহকারী।

আসলে কৃস্টিনা ছিল খুবই মিশুক। থাকার ব্যাপারে আমরা তাকে হোটেলে রাখার প্রস্তাব দিলে সে বললো, কেন তোমরা কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো? আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করি।

তোমার অসুবিধার কথা চিন্তা করে এ কথা বলেছিলাম। তুমি যদি থাকতে পারো, তবে আমরাও খুব খুশি হবো।

এরপর থেকে কৃস্টিনার জন্য একটা বাথসহ এসি করা রুমটির ব্যবস্থা করা হয়।

রাতে কৃস্টিনা তার রুমে ঘুমাতে গেলে আমরা সব ভাইবোন তখন আরিফভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন - পলাশভাই রুমীভাই, শিমুল ও আমি। আরিফভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাইয়া, তোমার প্রবাস জীবনের ভয়ংকর বা খুব স্মরণীয় কোনো স্মৃতি আছে?

আছে।

কি সেটা জানতে পারি?

তবে শোন সেই ঘটনাটা।

একদিন চিন্তা করলাম, উত্তর লন্ডনের এক বন্ধুর ওখানে যাবো। তাই সহজ পথ পাতালরেলে গিয়ে উঠলাম। আমার আসনে আমি বসে আছি। সামনের কয়েক সিট পরে দেখছি পাচ ছয়জন তরুণ-তরুণী বসে আড্ডা মারছে আর ড্রিংক করে যাচ্ছে। আমি এশিয়ান এটা বুঝতে পেরে একটা যুবক চিৎকার করে বললো, গোটা কম্পার্টমেন্টটা আমাদের। আমরা এখানে নাচবো, গাইবো বান্ধবীদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করবো। কিন্তু কোনো এশিয়ানকে এখানে থাকতে দেবো না।

এ কথা শেষ না হতেই অন্য একটা তরুণী তার বয়ফেন্ডকে বলছে, ডারলিং, ওকে একটু ড্রিংক দিয়ে এসো, সে আমাদের সঙ্গে এনজয় করুক।

আমি চিন্তা করলাম, অবস্থা তো খুবই খারাপ। ওরা সবাই বেশি ড্রিংক করেছে। এদের মধ্যে কেউ সুস্থ নয়। তাই বড় কোনো ঘটনা ঘটার আগেই সিট ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে এক মাতাল আমাকে লক্ষ্য করে একটা বোতল ছুড়ে মারে। অল্পের জন্য আঘাত থেকে রক্ষা পাই।

ভাইয়া, এটা তো খুবই বর্ণবাদী অসভ্যতম আচরণ, তুমি ট্রেনের পুলিশকে জানালে না ঘটনাটা?

ট্রেনের পুলিশকে জানিয়েছিলাম। পুলিশ ভদ্রলোক আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ওরা খুবই অসভ্য, আমরাও ওদের সঙ্গে পারি না। ওদের কাজই এটা। কারখানা থেকে কাজ করে ফেরার পথে ক্লান্তি দূর করার জন্য মদ খেয়ে নাচ-গান করে, পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে চুমু খায়। আপনি ওখানে থাকাতে ওরা বিব্রতবোধ করছিল। কিন্তু কোনো বৃটিশ নাগরিক থাকলে ওরা কিছু মনে করতো না। এরপর আমাকে আলাদা রুমে আসন করে দেয়।

ভাইয়া, তুমিও বর্ণবাদের শিকার হয়েছো জেনে খুব কষ্ট লাগলো।

এটা এখন ইংল্যান্ডের প্রধান সমস্যা। তাই বলে সবাই বর্ণবাদী নয়। ওইখানে তখনো কিছু ভালো লোক আছে বলে আমরা থাকতে পারছি। যেমন কৃস্টিনা, মার্টিন, জেমস এরা আবার খুবই উদার।

এরপর পলাশভাই বললেন, আরিফ, সত্যি করে বলতো তুই কি কৃস্টিনাকে বিয়ে করেছিস,

তোকেও কি মায়ের রোগে পেল নাকি! তবে শোন, তোরা তো বড় হয়েছিস, তোদেরকে বলা যায় আসল ঘটনা। কিন্তু মাকে বলবি না।

আমরা রাজি হলে ভাইয়া বলতে লাগলেন।

আমার এক শিক্ষক ওয়াটসন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিল, তোমার বাংলাদেশ হলো *তলাবিহীন ঝুড়ি।*

আমি এ যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেছিলাম, বাংলাদেশ বর্তমানে তলাবিহীন ঝুড়ি নয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশে হলো বিপুল পরিমাণের গ্যাসের ভাণ্ডার।

তারপর ওয়াটসন স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তোমার দেশে সম্পদ আছে। কিন্তু তার যথেষ্ট পরিমাণে সদ্ব্যবহার নেই। তার কারণে তোমরা সম্ভাবনাময় দেশ হওয়া সত্বেও অনুন্নত।

ওয়াটসনের কাছ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় এবং ক্লাসে ভালো ফলাফলের কারণে শিক্ষকসহ ছাত্রছাত্রীদের মনের ওপর আমিসহ আমার দেশ ভালো একটা অবস্থান তৈরি করে নেয়। তখন থেকেই কৃস্টিনা বাংলাদেশের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃস্টিনা আর আমি এক সঙ্গে হলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, তোমার দেশের অবস্থা এখন কেমন, তোমার দেশে কি কি আছে, তোমার দেশের লোকেরা কি করে? ইত্যাদি আরো অনেক রকমের প্রশ্ন।

বুঝতে পারতাম না কেন সে এতো সব জিজ্ঞাসা করে।

একদিন রাতে প্রোগ্রামিংয়ে ব্যস্ত আছি। এমন সময় কৃস্টিনা আসে, সুস্থ মতো হাটতে পারছে না। বুঝতে পারলাম, সে ড্রিংক করেছে। সেদিন এতো পরিমাণে ড্রিংক করেছিল যে, আমি তার কাছে ভিড়তে পারছিলাম না অ্যালকোহলের গন্ধের জন্য।

বললাম, কি ব্যাপার কৃস্টিনা!

সে উত্তেজিত হয়ে বললো, চুপ, আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না, পল আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আমি ওকে ঘৃণা করি। আমি হোটেলের পণ্য নই,তুমি আমাকে একটু আজকের রাতের মতো আশ্রয় দাও।

বুঝতে পারলাম, পলের সঙ্গে নাইট ক্লাবে গিয়ে রাগারাগি হয়েছে। পল ওর বন্ধু ছিল।

ওর চুল, পোশাকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, খুবই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বললাম, কৃস্টিনা তুমি অযথা উত্তেজিত হয়ো না। শান্ত হও।

তার শোয়ার ব্যবস্থা করে রাতে পাশে এক বন্ধুর রুমে চলে গেলাম।

সকালবেলায় সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললো, কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। কখনোই চাইনি, তোমার সামনে ড্রংক করে আসবো।

ঠিক আছে, তুমি আর কখনো ওভাবে ড্রংক করবে না।

সে সুবোধ বালিকার মতো মাথা নাড়ালো। এরপর বললো, আমি জানি, গতকাল রাতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তোমাকে কষ্ট না দিয়ে আমার কোনো উপায় ছিল না। কারণ আমি যে রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম সে ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো বৃটিশ বন্ধুর বাসাতে যেতাম তবে নিশ্চিত কিস কিংবা স্পর্শের বিনিময়ে আমাকে আশ্রয় দিতো। আমি সেটা চাইনি। আমি জানি, তুমি মেয়েদের প্রতি আসক্ত নও। তাই আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। এই গুণটা থাকার কারণে তুমি আমার কাছ থেকে চিরকাল ভালোবাসা পাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুমি একজন আধুনিক বৃটিশ তরুণী হওয়ার পরও সেক্সের ক্ষেত্রে ফ্র নও এটা তো আমাদের মুসলিম নারীদের মতো কথা। আমাদের দেশের মেয়েরা জান দিতে প্রস্তুত তবুও সম্ভ্রম দেবে না।

আমি ওই রকম শিক্ষাই পেয়েছি স্কুল জীবনে দুজন আফ্রকান মুসলিম বান্ধবীর কাছ থেকে।

আমরা দুজনা অন্তরঙ্গ আলোচনায় ডুবে গেলাম। এক পর্যায়ে বললাম, আমি এশিয়ান মুসলিম, তুমি বৃটিশ কৃশ্চিয়ান। আমাদের মধ্যে কি সাংসারিক জীবনের বন্ধন সম্ভব? তার চেয়ে বরং তুমি বৃটিশ কোনো ভালো ছেলেকে নিয়ে সংসার করলে হয় না?

হয় না। কারণ বর্তমানে বৃটেনে চরিত্রবান কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমরা সবাই এখন ভোগবাদী হয়ে গেছি। বিয়ের পর স্বামী–স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের একটু সমস্যা হলেই আমরা ছেলেমেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্য নারী বা পুরুষকে বেছে নিই। ফলে আমাদের পারিবারিক বন্ধন স্থায়ী হচ্ছে না। তাই আমার জীবনের জন্য তোমার মতো ছেলের প্রয়োজন। তারপরও আমি বর্ণবাদী নই, এশিয়ান কিংবা বৃটেনের মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য নির্ণয় করি না।

এরপর আমি কোনো কথা না বললেই সে কান্না জুড়ে দিয়ে বলে, তুমি এখনো আমাকে কোনো কথা দিচ্ছো না, তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসো তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসবো। আর আমাকে না ভালোবাসার কারণ হিসেবে জানবো, তুমি আমাকে কুমারী হিসেবে মানো না। তবে আমি সত্যি করে বলছি, আমি এখনো ঠিক আছি।

কৃস্টিনার মুখে হাত দিয়ে বললাম, ছিঃ ছিঃ, তুমি আমাকে এতো নিচু ভাববে না। আমি ভাবছি অন্য কথা। তা হলো, জীবনের এ রকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তুমি আমার পরিবার, দেশ, সমাজকে বোঝো, ওই সমাজে গিয়ে চলতে পারবে কি না।

কৃস্টিনা আমার কথায় রাজি হয়। তারপর থেকেই সে আমাকে বোঝার চেষ্টা করছে।

এরপর পলাশভাই বললেন, বাহ! আরিফ, তুই তো বেশ ভাগ্যবান, কৃস্টিনার মতো এতো সুবোধ, ভদ্র মেয়ে পেয়েছিস। আসলে কি জানিস, ওকে বাঙালি মেয়েদের মতোই লাগে। ও কখনো শাড়ি পরেছে?

পরেছে। পরলে বোঝা যায় না যে সে বিদেশি। আরিফভাই বললেন।

সে কেন বাংলাদেশে এলো বললি না যে?

তাহলে শোন, এটা আরো একটা ঘটনা। একদিন কৃষ্টিনা অনেকগুলো ছবি নিয়ে আসে। আমি বললাম, কি ব্যাপার কৃষ্টিনা? মন খারাপ কেন? বসো। এগুলো কিসের ছবি?

সে কোনো কথা না বলে ছবিগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি ছবিগুলো দেখেই চমকে উঠলাম, ছবিগুলো এমনভাবে তোলা হয়েছে যে, কেউ দেখলেই শিউরে উঠবে। একটা ছবিতে একটা শিশু মেয়ে খালি গায়ে ভাঙা একটি ঘরের সামনে দাড়িয়ে আছে, পাশে আরো অনেক ছোট ছোট খুপরি, নিচে বড় ইংরেজি হরফে লেখা, *মেনি বাংলাদেশি লিভ ইন দিস ওয়ে।*

অন্য ছবিতে একটা কংকালসার লোক ভিক্ষা করছে। তাতে লেখা, *দে আর্ন বাই বেগিং*। আরো একটা ছবিতে একটা লোক গলাতে বড় টিউমার নিয়ে শুয়ে আছে। তাতে লেখা, *ডেথ ইজ দেয়ার লাস্ট ওয়ে।* অন্য ছবিতে ফতোয়াবাজির শিকার এক নারী, মৌলবাদীর উত্থান ইত্যাদি ছবি ছিল।

কৃষ্টিনার কাছে বাংলাদেশ বলতে এখন একটা ফকির–মিসকিনের দেশ, বাংলাদেশ বলতে একটা মৌলবাদীদের দেশ। এটা চিন্তা করতেই শিউরে উঠলাম, এখন ওকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো। ওর মনের মধ্যে বাংলাদেশের যে সুন্দর একটা লাল–সবুজ পতাকা অংকিত হয়েছিল, কিভাবে তার স্থায়ীত্ব বাড়াবো সেই চিন্তায় আমি অস্থির। আস্তে করে বললাম, ছবিগুলো কোথায় পেয়েছো?

বাবাকে তার এক বন্ধু দিয়েছেন। আর তিনি পেয়েছেন তোমাদের দেশের এক লোকের কাছ থেকে যিনি বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে কাজ করছেন। এবং শেষেরগুলো পেয়েছেন বাংলাদেশের এক মানব অধিকার সংগঠন হতে।

বুঝতে পারলাম, এগুলো এনজিওদের কাজ যারা সাহায্য সংগ্রহের জন্য এ ছবিগুলো পাঠিয়েছে। আর শেষেরজনদের কাজ হলো, বাংলাদেশের বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে দেশের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করা।

বললাম, তোমার বাবা কি মন্তব্য করলেন?

বলা যাবে না, তুমি শুনলে কষ্ট পাবে।

তুমিও কি বিশ্বাস করো আমার দেশ এ রকম!

না, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।

তাহলে শোনো, কোনো দেশকে মূল্যায়নের জন্য কতোগুলো ছবিই যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষণ যা ভ্রমণের মাধ্যমেই সম্ভব। এগুলো আমাদের দেশের বিচ্ছিন্ন চিত্র। এবং যারা এ কাজ করছে, তারা জেনে হোক আর না জেনেই হোক, তারা আমাদের দেশকে বিশ্বের কাছে ছোট করছে। যেমন বিদেশে পড়াশোনা করতে এসে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হয়েছিল আজ সেখানে সন্দেহের সৃষ্টি করলো এই ছবিগুলো। আমি তোমার এবং তোমার বাবার কাছে ছোট হলাম। এভাবে বৃটেনবাসীদের কাছে অসংখ্য বাংলাদেশি ছোট হয়ে থাকবে।

ছবিগুলোর ব্যাপক প্রচার হলো। আগে তোমাকে যে কথা বললাম, ভ্রমণ ছাড়া কোনো জাতিকে জানা যায় না। যেমন বৃটেনে আসার আগে আমার ধারণা ছিল, বৃটেন একটা ফ্ৃ সেক্সের দেশ। এখানকার সবাই লিভ টুগেদার করে, রাস্তা, পার্কে মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করা খুবই সহজ কাজ। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? এখানে তোমার মতো অসংখ্য কুমারী তরুণী আছে যারা ওই সব করে না।

কৃস্টিনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

আমার কালেকশনে থাকা গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ছবিগুলো ওর হাতে তুলে দিলাম। তাতে ছিল গ্রামবাংলার চিত্রের মধ্যে পড়ন্ত বিকেলে কৃষকেরা সোনালি ধান কেটে মেঠোপথে বাড়ি ফিরছে, সূর্য উদয়ের লাল আভায় ধান লাগানোর দৃশ্য, পাট ধোয়ার দৃশ্য, মেয়েরা ধান ভানছে, নকশি কাথা সেলাই করছে, নবান্নর পিঠা উৎসব, নৌকা বাইচ, বটের নিচে রাখালের বাশি বাজানো, শীতের সকালে খেজুরের রস নামানো, বসন্তের শিমূল গাছে পাখির গান, ঢাকার রাজপথ, শিল্পের উৎপাদন, কক্সবাজার, চা বাগান, সুন্দরবনসহ ঐতিহাসিক স্থানগুলো।

এগুলো দেখে কৃস্টিনা চিৎকার করে বললো, ওহ মাই গড! আমি এ রকমই চিন্তা করেছিলাম। তোমার দেশের গ্রামগুলো আসলেই খুব সুন্দর! আধুনিকতার স্পর্শ না পাওয়াতে ওইগুলো এখনো তাদের ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। ছবি দেখেই বুঝতে পারছি, তোমরা আসলেই পরিশ্রমী জাতি, ভিক্ষুক বা অলস নও। আমি যাবো তোমাদের দেশ দেখতে। আমাকে নেবে?

বললাম, ঠিক আছে তুমি চাইলে নিয়ে যাবো।

আচ্ছা, তোমাদের দেশের লোকেরা এতো পরিশ্রম করছে, তারা ফসল ঘরে তুলছে, তারা কালচার্ড – এসব না দেখিয়ে ওই কুৎসিত ছবিগুলো দেখিয়ে এনজিওগুলো সাহায্যের আবেদন করে কেন?

তুমি গিয়েই জিজ্ঞাসা করো কেন তারা এ ছবি দেখিয়ে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নস্যাৎ করে আমাদেরকে ছোট করছে।

তোমাদের দেশ বর্ণবাদ বা নারী নির্যাতনের শিকার?

এটাও মিথ্যা, আমাদের দেশের নারীরা আগের মতো আর ঘরমুখী নয়। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী যা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। এবং মৌলবাদীদের উত্থানের সম্ভাবনা নেই। কারণ আমাদের জনগণ ধার্মিক কিন্তু উগ্র নয়। সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবৈষম্য প্রতিবেশী দেশ কিংবা তোমাদের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় সেটা কোনো বৈষম্যই না। তুমি যখন যাবে তখন আরো জানতে পারবে।

এখানেই আরিফভাই গল্প শেষ করলেন।

আমরাও বুঝতে পারলাম কেন কৃস্টিনা বাংলাদেশে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যে বছর কৃস্টিনা বাংলাদেশে আসে অর্থাৎ ২০০০ সালের নভেম্বরে সেই বছরে দুর্নীতির জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবার তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। এ বছর মৌলবাদী প্রচারে সুবাদে আমেরিকার কল-ইন রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসে সেই একই দলের কৃতিত্বের সুবাদে।

কৃস্টিনা সেই বছর বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে ঘুরে মন্তব্য করে গেছে, তোমাদের দেশের উন্নতির জন্য বিদেশি সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি তোমাদের কৃষিজ পণ্যকে শুধু ইওরোপ পর্যন্ত পৌছাতে পারো তবে তোমরাই নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারবে। কারণ এতো সহজে শস্য উৎপাদন ও কম দামে শস্য বিক্রি দক্ষিণ এশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও হয় না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে তোমাদের লন্ডন প্রবাসী রেস্টুরেন্ট শিল্পের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশিরা। তারা বাংলাদেশের খাবার ও বাংলাদেশের কৃষিজ পণ্যকে আমাদের দেশে পরিচিত করে তুলতে পারে।

সেদিন তার কথার মর্ম বুঝতে না পারলেও আজ বুঝতে পারছি, কৃস্টিনা সেদিন কতো মূল্যবান কথা বলেছিল। একটা দেশের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা না থাকলে ওই রকম বিশ্লেষণধর্মী কথা বলা যায় না!

কষ্ট লাগে তখনই, যখন দেখি একজন বিদেশি হওয়ার কারণে কৃস্টিনা বাংলাদেশকে ভালোবেসেও তার প্রতিদান এখনো পায়নি। যার জন্যে সে বাংলাদেশকে চিনলো সেই মানুষটিকে এখনো কাছে পায়নি। এখানে বাধা হয়েছে তার ধর্ম ও বর্ণ। ধর্ম পরিবর্তন করলেও বর্ণের কারণে আমরা তাকে বাংলাদেশি হিসেবে স্বীকৃতি দেবো না। এই মানসিকতা আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে যে, শাদা চামড়ার মেয়েদেরকে বিয়ে করা যাবে না। শাদা-কালো বড় কথা নয়, বুঝতে হবে আগে মানুষের মন। কৃস্টিনার বুকে লাল-সবুজ পতাকা কতোটুকু স্থান করে নিয়েছে তা ভেবে কি আমরা তাকে বাংলাদেশের বন্ধু ভাবতে পারি না!

বাংলাদেশকে ভালোবেসে তুমি যে সৎসাহস দেখিয়েছো, আশা করি, তুমি তার প্রতিদান হিসেবে তোমার প্রিয়জনকে পাবে। যদি লন্ডনে যায়যায়দিন পেয়ে থাকো তবে তোমার জন্য রইলো আমার ছোট একটি বার্তা I like you very much.

হাতেম খা, রাজশাহী থেকে

আপন

– মাশা

আমার এই আটাশ বছরের জীবনে বাংলা দুটি জিনিসের ওপরে আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ। প্রথমটা যায়যায়দিন, অন্যটি হুমায়ূন আহমেদের বই। প্রবাস জীবনে চরম ব্যস্ততার মধ্যে বই পড়া এক ধরনের বিলাসিতা হলেও আমি সব কিছু বাদ দিয়েও অন্তত যায়যায়দিনের স্পেশাল সংখ্যাগুলো পড়ার চেষ্টা করি। এ চেষ্টার ফল হচ্ছে আজকের এই লেখা। আমি জানি না, আমার এই লেখা প্রকাশ হবে কি না। দীর্ঘ দিন বাংলা লেখা ও পড়া থেকে দূরে থাকার জন্য সুন্দর করে বাংলা লেখা বা পড়া আমার জন্য কঠিন। তারপরও চেষ্টা করছি। জানি না কতোটা সফল হবো।

ছোটবেলা থেকে প্রবাস বা বিদেশ সম্পর্কে আমার এক ধরনের মোহের জন্ম হয়েছিল। বিদেশি মুভি, বই, মিউজিক আমাকে আকৃষ্ট করতো। এ আকর্ষণ থেকেই এক সময় কেমন করে জানি বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর আমেরিকায় প্রবাসী হলাম।

এয়ারপোর্টে যখন নামলাম তখন শুধু চারদিকে শাদা বরফ দেখেছি। বরফ-এর সৌন্দর্য যে কি অদ্ভুত তা বোঝার ক্ষমতা আমার সেই বয়সে না থাকলে কেমন করে জানি সৌন্দর্যে মোহিত হলাম। পেছনে পড়ে থাকলো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী ও চিরচেনা পরিবেশ ফেলে আসার কষ্ট। ডে বাই ডে কষ্টগুলো আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করতো সব কিছু ফেলে দেশে ফিরে যাই। কিন্তু কোন একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ধরে রাখতো। এক সময় শক্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম তা মনোকষ্ট নয় এবার সত্যিই প্রবাস ত্যাগ করে দেশে চলে যাবো।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। শুরু হলো পূর্ণদ্যোমে ব্যাগ গোছানোর পালা। ওই যে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম, ওই গোছানো ব্যাগ আজ পর্যন্ত ওই রকমই রয়ে গেল। প্রবাস জীবনের অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ কিছু ঘটনা আমার জীবনের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে দিল। আস্তে আস্তে প্রবাস জীবনকে বেশি ভালোবেসে ফেললাম। সেই সব ক্ষুদ্র ঘটনার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরছি। যেমন –

বাসা থেকে আমার কলেজের দূরত্ব ছিল প্রায় দশ মাইল। আমার ক্লাস ছিল বিকাল পাচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। সকাল ছয়টা থেকে দুপুর তিনটা আমি কাজ করতাম। এভাবে চলতো পুরো সপ্তাহ। অবসর বলতে কোনো কিছুই ছিল না।

যন্ত্রের মতো জীবন কেটে যেতে লাগলো। কখন সামার চলে গেল, কখন শীত এলো টের পেতাম না। একদিন ভোরে যখন চোখ খুলে চারদিকে বরফের চাদর দেখতাম তখন বুঝতাম শীত চলে এসেছে। সেই সময় আমি ছিলাম মিডওয়েস্ট–এ।

আমেরিকায় মনে হয় মিডওয়েস্টেই বেশি ঠাণ্ডা পড়ে। শীতে বিকাল তিনটার বলতে গেলে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়। রাত আটটা গভীর রাত। সেই রকম শীতের একদিনে আমিও ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরছি। ক্লাস শেষে বুঝলাম প্রচণ্ড বরফপাত শুরু হয়েছে। খুব সাবধানে ড্রাইভ করছি। কিন্তু মাঝ পথে হাইওয়েতে আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল।

আমার হাতে কোনো সেলফোন নেই। হাইওয়েতেও গাড়ির সংখ্যা একেবারেই কম। কেউ কোথাও নেই। এই অবস্থায় আমি ঘণ্টাখানেক সেখানে থাকলে ঠাণ্ডায় একদম মারা যাবো।

নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল। হঠাৎ করে আমার পাশে একটি গাড়ি থামলো। সেখান থেকে একজন আমাকে হেলপ করার জন্য এগিয়ে এলো। তার সেলফোনে বাড়িতে ফোন করে সব জানালাম।

ইতিমধ্যে দেখি দুজন তরুণ স্মার্ট হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ এসে হাজির। তারা আমাকে পরম নিরাপত্তার সঙ্গে রাইড দিয়ে বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে গেল। তারা ছিল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। আমি ছিলাম তাদের কাছে একজন অতি নগন্য বিদেশি। তারপরও তারা আমাকে পূর্ণ সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়ে বাসায় পৌছে দিয়ে গেছে। বিদেশি হিসেবে অবহেলা করেনি।

সবশেষে যখন তাদের ধন্যবাদ জানালাম তখন তার প্রতি উত্তরে তারা আমাকে যা বললো তার অর্থ হলো, স্টেট–এর প্রত্যেকটি মানুষের নিরাপত্তা দেয়াই তাদের কাজ। এক্ষেত্রে তারা শুধু তাদের ডিউটি পালন করেছে, এর বেশি কিছু নয়।

তাদের কথায় মুগ্ধ হয়ে শুধু চিন্তা করলাম, হায়! এই অবস্থা যদি আজ বাংলাদেশে হতো তাহলে কি হতো? আমার মতো আঠারো বছরের মেয়েকে একা যদি বাংলাদেশের পুলিশরা পেতো তাহলে সে রাতে কি অবস্থা হতো! এই তুচ্ছ ঘটনা প্রবাস সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে দেয়। দেশের প্রতি আকুলতায় কিছুটা ফাক পড়ে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, আমি যে কম্পানিতে স্টুডেন্ট অবস্থায় কাজ করতাম সেখানে জব ছিল কাস্টমার সার্ভিস। প্রতি মুহূর্তে ফোনে কাস্টমারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। আমার কলিগরা ছিল প্রত্যেকেই আমার চেয়ে সিনিয়র। সবচেয়ে সিনিয়র ছিল রিনে। তার বয়স ছিল একান্ন। একজন আঠারো–এর

সঙ্গে সে একজন একান্ন বছর মহিলার কি গভীর বন্ধুত্ব হতে পারে তা আমাদের দুজনকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তার নাতনিরা ছিল সব আমার বয়সী।

একদিন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে কাজে গেলাম। কয়েকদিন ক্লাস টেস্ট–এর কারণে কাজ করতে পারিনি। সাত দিন অনুপস্থিত থাকার পর যদি সেদিন কাজে জয়েন না করি তাহলে সত্যিই কাজটি আমার চলে যাবে।

তাই প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে কাজে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে রিনে আমাকে জড়িয়ে ধরে লাঞ্চ রুমে নিয়ে গিয়ে গরম কফি আর Thenraflu (ফ্লুর জন্য এক প্রকার ওষুধ) দিয়ে গেলেন।

তিনি কিছুতেই আমাকে কোনো কাজ করতে দিলেন না। আমার সমস্ত কাজ তিনি করে দিলেন এবং এটা যেন সুপারভাইজারের চোখে না পড়ে সেভাবে সব কিছু মেনটেইন করলেন।

এভাবে ক্রমাগত তিন দিন কাজে গেলাম। কিন্তু কোনো কাজ না করে বরং বিশ্রাম নিয়েই আয় করলাম।

চতুর্থ দিন এ রেনের ছুটি ছিল, আমারও ছিল। সেই সকাল দশটায় আমাদের বাসায় চলে আসেন। তিনি আমার জন্য অনেক রকম রান্না করে নিয়ে এলেন। মজার ব্যাপার, ইনডিয়ান এক মহিলার কাছে চিকেন বিরিয়ানি রান্না শিখেছিলেন। শুধু আমাকে খাওয়ানোর জন্য সেদিন সে তা করে এনেছিলেন।

আমার বড় বোন তার কান্ড দেখে অবাক। তিনি এসেই আমার সেবা করা শুরু করলেন। তাকে যতো বলি আমার সেবার দরকার নেই, আমার বোন আমাকে এই সাত দিন যথেষ্ট সেবা করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো কথাই শুনতে রাজি নন।

আমার প্রতি তার এই গভীর ভালোবাসা আমাকে দেশে অবস্থানরত মায়ের কথা মনে করে দিয়েছিল। আমার মতো একজন সামান্য মেয়ের জন্য রেনের এই ভালোবাসা আমার দেশের প্রতি তীব্র আকর্ষণকে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল।

আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে পারলাম, এরাই আমার আপন। এরাই আমার চেনা এখন থেকে।

আমেরিকা থেকে

স্বপ্নের মৃত্যু

– রাশেদ বিন কালাম

১৯৯৫ সাল। আমার এইচএসসি পরীক্ষা শেষ। অবসর সময়ে বাবার সঙ্গে দোকানে বসেছি। চট্টগ্রাম রিয়াজউদ্দিন বাজারে আমাদের একটি জুতার দোকান আছে। ঘরের বড় ছেলে হিসেবে বাবাকে সামান্য সাহায্য করা দায়িত্ব মনে করলাম। এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি পোস্টার। চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো মডেলিং কর্মশালা শুরু হচ্ছে। ঢাকা থেকে নোবেল, পল্লব, তানিয়া, সুইটি, তমালিকাসহ আরো অনেকে আসছে ট্রেনিং দিতে। ট্রেনিং শেষে যোগ্যতা মতো সুযোগ দেয়া হবে এ ধরনের আশ্বাস দেয়া হলো।

আমি বরাবর একটু সংস্কৃতিপ্রেমী। স্কুল থেকে গান ও নাটকে অনেকবার অংশগ্রহণ করেছি। বেশ প্রশংসা পেয়েছি মানুষের। পুরস্কৃত হয়েছি অনেকবার। তাই মডেল হওয়ার স্বপ্নে ভর্তি হলাম কর্মশালায়। ভর্তি ফি যোগাড় করতে সামান্য কষ্ট হলেও কোনো রকমে যোগাড় করেছি।

শুরু হলো কর্মশালা। প্রায় দেড়শজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হলো কর্মশালা। এক মাস ট্রেনিং নেয়ার পর শুরু হলো চট্টগ্রামে প্রথম ফ্যাশন শোর জন্য মডেল নির্বাচন। এগারোজন ছেলের মধ্যে আমিও নির্বাচিত হলাম। মনে আত্মবিশ্বাস জন্ম নিল। অনেক অনুশীলন ও সাধনা করে শেষ করলাম জীবনের প্রথম ফ্যাশন শো। বেশ ভালো হয়েছে শোটি। মডেলরা বেশ আলোচিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি কম্পানি ফ্যাশন শো করলো। আমি প্রায় প্রতিটি শোতে অংশ নিলাম। এভাবে চট্টগ্রামে ছোট ও বড় ব্যানারে বেশ কয়েকটি শো করলাম।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর ভাবলাম চট্টগ্রামে বসে কিছুই হবে না। তাই মাঝে মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন অ্যাড ফার্মে ছবি, পোর্টফোলিও জমা করলাম। সবাই আশ্বাস দিল, তুমি কাজ করতে পারবে।

অনেক দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়েছি। শেষে জানতে পারলাম এখানে যোগ্যতার চেয়ে চেনাজন, লবিইং ও যোগাযোগটাই বেশি প্রয়োজন। চট্টগ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় এখানে বেশি দিন থাকতে পারি না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়ে কতোটা ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ রাখা যায়। তারপরও আমি টিউশনির টাকা, বাবার দেয়া হাত খরচের টাকা সব মিলিয়ে অনেকবার ঢাকা-চট্টগ্রাম আসা যাওয়া করেছি।

এরপর পরিচয় হলো ইসমাইল নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে যার চাচা ছিলেন পরিচালক এহতেশাম। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তার মাধ্যমে এহতেশামের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ও আরো অনুশীলনের পরামর্শ দিলেন। এবং এফডিসি-তে ঢোকার পাস নিয়ে দিলেন। তারপর আমি বেশ কয়েবার এফডিসিতে গিয়েছি। সেখানে অন্য নায়ক-নায়িকার দিকে আমার তেমন নজর ছিল না। আমার টার্গেট ছিল সালমান শাহ। আমি তার ভক্ত ছিলাম। তার কথাবার্তা, চলাফেরা, স্টাইল সব আমার ভালো লাগতো। অনেক সময় তাকে অনুকরণও করতাম। তার ছবিগুলো দুই তিনবার করে দেখতাম। হঠাৎ তাকে পেয়ে গেলাম সামনে এফডিসিতে। তিনি চট্টগ্রামের জামাই ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে *শালা* বলে জোক করতে লাগলেন। এভাবে কাজের ফাকে ফাকে তার সঙ্গে অনেক কথা বললাম। আমার মনের স্বপ্নের কথা বললাম, আমার ছবি দেখালাম।

তিনি আমাকে বললেন, সালমানরা কেউ মায়ের পেট থেকে সালমান হয়ে জন্মায় না। পৃথিবীতে এসে কর্মগুণে কেউ সালমান, কেউ শাহরুখে পরিণত হয়। তুমিও চেষ্টা করো, আশা করি তুমি সফল হবে।

তার সেই কথাগুলো আমার সারা জীবন মনে থাকবে। কিছুদিন পর সালমান শাহ চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। তার এই মৃত্যু আমার সব কষ্টগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি এখনো প্রতি ৬ সেপ্টেম্বর ব্যক্তিগত শোক দিবস পালন করি।

এরপর ঢাকা-চট্টগ্রাম আমার যোগাযোগ চলতে থাকে। ডিরেক্টর, তাদের পিএস, অ্যাড নির্মাতা ও এই লাইনের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তারা কেউ কেউ নতুন এই অজুহাতে কাজ দিল না। কতোগুলো কাজে ঘুস দিতে পারিনি বলে বাদ পড়েছি। তবে আমি হাল ছাড়িনি। চট্টগ্রামের *সিটিভি-*

র উপস্থাপিকা পারুআপার সঙ্গে কাজ শুরু করলাম। সিটিভি–তে কাজ করলাম তার সঙ্গে। তিনিও আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন। যোগাযোগ করেছেন তার পরিচিত অনেকের সঙ্গে এবং আমাকে বললেন, তোর কাজ হয়ে যাবে, তুই একদিন স্টার হয়ে যাবি।

বন্ধুরা সবাই আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলো আমার স্বপ্ন ভঙ্গের দিন। পারুআপা চলে গেলেন ইনডিয়াতে ফ্যাশনের ওপর পড়ালেখা করতে। আমার কাতারে অবস্থানরত মামা বাবাকে অফার দিলেন আমাকে কাতার পাঠানোর জন্য।

বাবা আমাকে বললেন এবং একদিনের সময় দিলেন।

অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম কাতার চলে যাবো। আগের অভিজ্ঞতা, মানুষের দ্বারে দ্বারে ধর্না দেয়া, অর্থের জন্য বাদ পড়া এসব বিষয় ভেবে ঠিক করলাম জীবনে টাকাটাই বড়। টাকা দিয়ে সব হয়। প্রয়োজনে টাকা রোজগার করে আবার চেষ্টা করবো। অবশেষে সব ঠিক হয়ে গেল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে রওনা দিলাম কাতারের উদ্দেশ্যে। একটি স্বপ্নের কবর রচনা হলো, শুরু হলো নতুন স্বপ্ন দেখা।

কাতারে পৌছে গেলাম। চাকরি নিলাম ফুড আইটেম–এর একটি দোকানে। জীবনের প্রথম চাকরি। প্রথম দিনেই অবাক হয়ে গেলাম। দৈনিক প্রায় চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা কাজ। প্রচুর ব্যবসা হয় এখানে। সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এভাবে কয়েক মাস করার পর কেমন জানি হাপিয়ে উঠলাম। ভাবলাম, হয়তো বেশি দিন এখানে থাকা যাবে না। আবার যখন ভাবলাম, প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ করে এসেছি, এগুলো শোধ না করে দেশে ফেরত গেলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না। তাই কাজে মনোযোগ দিলাম। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম চালাতে লাগলাম। পজিশন ভালো করার জন্য লাইসেন্স নিলাম। আস্তে আস্তে নিজেকে স্থির করে নিলাম।

সবাই আশ্বাস দিল, দুই বছর পর কম্পানি চেঞ্জ করে অন্য একটি ভালো কম্পানিতে কাজ করতে পারবে। এভাবে কেটে গেল দুই বছর। বাড়ির কর্জও প্রায় শেষ। শুরু করলাম চেঞ্জ করার জন্য তদবির। অনেক ঘোরাঘুরির পর জানতে পারলাম আমার ভিসাটি পরিবর্তনযোগ্য নয়। আরেকটি স্বপ্নের কবর রচনা হলো। খুব হতাশ হলাম। কিন্তু বিপদের বন্ধু বাবলু, মামুন, মুন্না, মুনিরসহ অনেকে আমাকে সাহস দিল। আবার সেই পুরনো কাজে মনোযোগ দিলাম। এখনো পর্যন্ত সেই অবস্থানে আছি। তবে আগের থেকে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা বেড়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে চাকরি করি সেখানে বছরে একটি দিনও ছুটি নেই।

প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই ছক বাধা কাজ করতে করতে আমি এখন ক্লান্ত। কিন্তু কিছুই করার নেই, বিদেশ আসার পর থেকে দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে অনেক। ঘরে বিয়েযোগ্য ছোট বোন, ছোট দুই ভাই। তাদের ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে অনেক সময় সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাইলেও যেতে পারি না। তাই পদে পদে শত বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি। আমি জানি, আমার ক্যারিয়ার নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সবাইকে খুশি করার মধ্যে নিজের আনন্দ খুজে পাই। সারা মাস কাজ করে বেতন নিয়ে যখন বাড়িতে পাঠাই এবং যখন খবর পাই টাকাগুলো তারা পেয়েছে তখন আনন্দে বুক ভরে যায়। এখানেই আমার মতো লাখো প্রবাসীদের সুখ ও আনন্দ।

এখানে এসে হারিয়েছি অনেক কিছু। খুবই কাছের আমার দাদির মৃত্যু। তাকে শেষবারের মতো দেখতেও পারলাম না। মিস করি প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই। নিজের জন্মদিন, একজন প্রিয় মানুষের জন্মদিন। একমাত্র ভাগ্নি নিহালের জন্মদিন যাকে আমি এখনো দেখিনি।

দুই ঈদের দিন, ভ্যালেনটাইনস ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট, ২১ ফেব্রুয়ারি। এ রকম বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে ভীষণ কষ্ট হয়। বিশেষ করে ঈদের দিনগুলোতে কান্না বন্ধ হতেই চায় না। চোখের সামনে ভাসতে থাকে আগের সেই ঈদের দিনগুলোকে।

একজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। সেই নাকে তিলওয়ালি মেয়েটি যাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতাম না। আজ পরিস্থিতি তাকেও ভুলিয়ে দিয়েছে।

তবে সব কিছু ভুলে যেতে চাইলেও পারি না। সব সময় তার চেহারা সামনে ভাসতে থাকে। আবার যখন কাজে ডুবে যাই তখন সব ভুলে যাই। এখানে প্রবাসে সবাই কাজকে গুরুত্ব দেয় বেশি। কাজ আর কাজ, এর মধ্যে কেটে যাচ্ছে বছরের পর বছর। কখন দেশে ফিরবো তা আমার জানা নেই। আমার গন্তব্যও আমার জানা নেই। সামনের দিনগুলো কেমন হবে এখন তা নিয়ে ভাবি না। শুধু বর্তমান নিয়ে যতো চিন্তা-ভাবনা।

এতো কষ্ট, এতো ত্যাগের পর পরিবারের সবাইকে খুশি করতে পারবো কি না! নিজের সম্পর্কে শুধু বলতে চাই, প্রিয় শিল্পী নচিকেতার সুরে -

শুধু বিষ শুধু বিষ দাও
অমৃত চাই না।

কাতার থেকে

ইন্টারভিউ

– নীলা

প্রায় তিন মাস আগে এক প্রবাসী ছেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ছেলের উদ্দেশ্য, বিয়ের জন্য মেয়ে খোজা। বাসার বাইরে উভয়পক্ষের অভিভাবকের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিচয় ও বায়োডাটা দেয়া-নেয়া। এখানে আমার ও ছেলের কথোপকথন তুলে ধরছি (রুমে আমরা দুজন মাত্র)।

ছেলে : তুমি আমার সম্বন্ধে কি জানতে চাও বলো।

আমি (সংকোচে) : আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। জীবনে প্রথম কোনো ছেলের সঙ্গে একাকী কথা বলছি।

ছেলে : তুমি কি রিসেন্টলি ইসলামিক মাইন্ডের হয়েছো, নাকি সব সময়?

আমার মাথা নিচু। ড্রেসও একটা ব্যাপার।

আমি চুপ। সব কি বলা যায়?

ছেলে : কথা না বললে কি করে হবে?

আমি : আমি কি বলবো? আমার ফ্যামিলি যা ডিসাইড করবে তাই হবে।

ছেলে : ফ্যামিলি! (কিছুটা অবাক হয়ে)

আমি : (কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে) দেখুন, আমার অনার্সে তিন বছরের জায়গায় লেগেছে চার বছর এবং মাস্টার্সের এক বছরের জায়গায় দুই বছর। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমর বয়স বেশি। পচিশ বছর।

ছেলে : ফোর ইয়ার্স গ্যাপ।

আমি : কিসের?

ছেলে : এই যে আমি ১৯৮৮ আর তুমি ১৯৯২তে এসএসসি।

আমি : (শোধরানোর ভঙ্গিতে) আমি ১৯৯৩।

ছেলে : ও আচ্ছা।

আমি : (কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে) আপনি কি করেন?

ছেলে : তুমি আমার বায়োডাটা দেখোনি? (খুব অবাক হয়ে)

আমি : না। ওটা দেখা গার্ডিয়ানদের ব্যাপার।

ছেলে তার সার্ভিস ও কর্মস্থল সম্পর্কে বললো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে চলে আসবেন? না আমেরিকায় থাকবেন?

তার উত্তর : বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসবো আর আমার তো গৃন কার্ড আছে।

বললাম, আমার এতো ইনটারেস্ট নেই গৃনকার্ডের ব্যাপারে।

আরো বললাম, ওখানে যারা থাকে তাদের সঙ্গে ব্যালান্স রাখতে তো অনেক কিছু করতে হয়।

তার উত্তর : ওখানে অনেকেই ড্রিংক করে, পার্টিতে যায়, আমি ওসব পছন্দ করি না। আবার বললো, ওখানে আমার ফ্রেন্ডস আছে, আমরা সেলিব্রেট করবো।

বললাম, আসলে আমি আরো পড়াশোনা করতে চাচ্ছি। এটা অবশ্য চাকরি সংক্রান্ত পড়া।

তার উত্তর : তুমি তো ওখানেও পড়াশোনা করতে পারবে।

বললাম, আমি তো কিছুই পারি না।

বললো, শিখে নিলেই হয়। তোমার কেমন ছেলে পছন্দ?

আমি (কিছুটা রাগ নিয়ে) বললাম, দেখুন, আপনার তো দরকার স্মার্ট, কালচারড মেয়ে?

স্মার্ট, মানে, বলে সে আমার রক্ষণশীল পোশাকের দিকে সে তাকালো। পরে জিজ্ঞাসা করলো, আফটার ম্যারেজ-এ কি করতে চাও?

আচ্ছা, আপনারাই বলুন, একদিনে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলের সঙ্গে কতোটুকু কথা বলতে পারি? তাই কিছুটা রাগ করে হেসে বললাম, এখানে অনেক স্টেজ আছে। আপনি এতো ডিপ-এ যাচ্ছেন কেন?

হেসে তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ যেটা জানি তা হচ্ছে, ছেলের মা-ই সাধারণত মেয়ে দেখতে আসেন।

সে হেসে উত্তর দিল, আছে।

বললাম (হেসে), আছে তো, আপনি এসেছেন কেন?

পরবর্তীকালে আমার গার্ডিয়ান রুমে ঢুকলে সে তাকে বললো, ও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে কমফোর্ট ফিল করছে না। হাসির কথা বললো। আমি আসাতে ও খুশি হয়নি।

ছেলে এবং আমার অভিভাবক দুজনে মিলে হো হো করে হাসলো। আমি হাসবো না কাদবো বুঝতে পারছিলাম না।
ছেলের আব্বা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এসএসসি পাস করেছো কোথা থেকে?
সম্ভবত আমার কথা বলার জড়তা থেকেই এই প্রশ্ন। আমার নিজের জেলার নাম বললাম। হয়তো ওনার ধারণা ছিল, আমি ঢাকা থেকেই পাস করেছি।
আমার কথা হলো, প্রবাসী ছেলেরা কি এতোই আন্তরিক যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে এতো ফ্রেন্ডলি কথা বলতে একটুও সংকোচ হয় না। অবশ্য তার কথাবার্তা মুক্তমনের পরিচয় দেয় আর আমি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে এবং জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ বলে ইজি হতে পারিনি।

ঢাকা থেকে

অন্ধকার

– আলমগীর সাহেদ শুভ্র

১৯৯৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহান দিন। এই মহান দিনে পাড়ি জমিয়েছি প্রবাসের মাটিতে ইউনাইটেড আরব আমিরাত সংক্ষেপে এমিরেটস–এ। সে দেশের ছোট একটি শহর আল আইন। সে আল আইন শহরে এসেছি। অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা নিয়ে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি মা–বাবা, ছোট ভাই–বোন সবার চাওয়া–পাওয়ার ঝুলি। বাংলাদেশে সে সঙ্গে আমি রেখে এসেছিলাম আমার ভালোবাসাকে। সেই ভালোবাসা যাকে আমি একদিন না দেখলে মনে হতো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হতে চলেছে। সে ভালোবাসাকে রেখে এসেছি বাংলার বুকে।
‘শা’ দিয়ে তার নামের শুরু। তাকে বলে এসেছি তিন বছর অপেক্ষা করতে। তিন বছর পর দেশে গিয়ে তাকে বিয়ে করবো। শা কথা রেখেছিল। আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু আমি পারলাম না আমার কথা রাখতে। আমাকে পাবার জন্য অনেক অপমান, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করলো। কিন্তু আমার যাওয়া আর হলো না। এখানে আসার তিন বছর পর তার বিয়ে হয়ে গেল।
লাল বেনারসি পরে বধূ সাজিয়ে তারা নিয়ে গেল যে সানাই বাজিয়ে।
বিয়ের এক মাস পর শুনতে পেলাম তার বিয়ের খবর। সেই থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছি। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে শুনতে পেলাম তার একটি কন্যা সন্তান এসেছে। প্রায় চার বছর পর দেশে গেলাম। দেশে গিয়ে মনে হলো যেন নিজের যন্ত্রণা বাড়ালাম। তারপরও মা–বাবা, ভাই–বোন সবাইকে ঘিরে কিছুটা শান্তি, আনন্দ খুজে পেলাম। হৃদয়ের যন্ত্রণাকে চাপিয়ে রাখলাম।
খুজতে লাগলাম হারানো সে ভালোবাসাকে। সে এলো তার কন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে। তার সঙ্গে দুইবার দেখা হলো। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হলো না এখনো আমার জন্য তার হৃদয় কাদে। পাচ মাস দেশে থেকে আবার প্রবাসে চলে এলাম। ভুলতে পারলাম না আমার ভালোবাসাকে। এখনো আমার ভালোবাসা শুধু তার জন্য।
পরিশেষে বাংলার যুবকভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনারা যে স্বপ্ন ও আশা নিয়ে প্রবাসে আসতে চান তার এখানে কিছুই নেই। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তাই দেশের ছেলে দেশেই থেকে যান।

শুধু আমি না, আমার মতো অনেক যুবক নতুন স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসে এসেছে তাদের স্বপ্নই ভঙ্গ হয়েছে। নিজের জন্য কিছুই তো হলো না, মা–বাবা, ভাই–বোন কারো আশায় পূরণ করতে পারলাম না। এটাই হচ্ছে প্রবাস জীবন।

ইউ.এ.ই থেকে